অলকা

শ্রীমতী পুষ্প বসু

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীধিরাজকৃষ্ণ বসু বার-এট-ল ‌।
৫০ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৪৫
মূল্য—১।।০

প্রিন্টার
বি, এন, ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর
শ্রীচরণ কমলে উৎসর্গ
করিলাম।

অলকা
শেষ আকর্ষণ
ও
অন্যান্য গল্প

শেষ আকর্ষণ

১

শ্রাবণের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, নিবিড় আঁধার সারা গ্রাম খানিকে যেন গ্রাস ক'রে রেখেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে টিপ টিপ ক'রে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। গ্রামের নাম সাদিপুর, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। গ্রামের লোক সর্ব্বদাই ভয়ে অস্থির, কখন দামোদর নদী রেগে গিয়ে প্রবল জলস্রোতে ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। প্রায় প্রত্যেক বছরই এই অঞ্চলে বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আজও যেন দামোদর মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে উঠছে ব'লে মনে হচ্ছে। কখন বান আসে এই ভয়ে সকলেই যে যার কাজ সেরে ঘরের ভিতর রয়েছে। ঘরের বাইরে বেরোতে কারো প্রাণ চাইচে না—এর চেয়ে বড় আশ্রয় যেন তাদের নেই, প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা বুঝি ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। বাইরে তাকালেই মনে হয় বিভীষিকাময়ী রাত্রি তার করাল বাহু প্রসারিত ক'রে যেন ধরতে আসছে।

এ হেন দুর্য্যোগে প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তিকে উপেক্ষা ক'রে সাদিপুরের বৃদ্ধা জমিদার গৃহিণী ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন কেন? অন্ধকারে তাঁকে খুব ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোতে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল। বয়েস কালে যে ইনি প্রসিদ্ধা সুন্দরী ছিলেন তা' এঁর মুখ দেখে বোঝা যায়। আজ সে মুখ খানি বড় ম্লান ও বিমর্ষ। বৃদ্ধার বয়স সত্তর বাহাত্তর হবে, কোমর ভেঙে গেলেও দেখে মনে হয় শরীরে ও মনে জরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এঁর একমাত্র মেয়ে ছাড়া জগতে আর কেউ নেই। কলকাতার কোন বিশিষ্ট ধনীর গৃহে কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। জামাইটী ঠিক মনের মত—নাতি নাতিনীও চার পাঁচটী হয়েছে। বৃদ্ধা দুবেলা তাঁর "গোপালজীর" কাছে মাথা খোঁড়েন, "ঠাকুর, সবাইকেই ত পেয়েছি, এখন যেন মেয়ের সংসারটী গোটা দেখে মরতে পাই। আমার সকল সাধই ত মিটেছে—আর কেন! আমায় যত শীঘ্র পার চরণে স্থান দাও।"

মেয়ে জামাই মাঝে মাঝে সাদিপুরে আসে, দু'একদিন থেকে আবার চলে যায়। জামাই মেয়ে দুজনেই বৃদ্ধাকে অনুরোধ করে, "মা, এখানে একলাটী থেকে কি হবে? আমাদের ওখানে চল, তোমার বয়স হয়েছে—কে দেখবে তোমায় এখানে? আমরাও বড় নিশ্চিন্ত হই মা।" নাতি নাতনী দিদিমাকে অনেক কাকুতি মিনতি সাধ্য সাধনা করে, কিন্তু সবই বিফল হয়—ক্ষুণ্ণমনে মেয়ে চলে যায়। বৃদ্ধা বা[illegible] বাগান পর্য্যন্ত মেয়ে জামাই নাতি নাতনীকে এগিয়ে দিয়ে আসে[illegible] আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গৃহে প্রবেশ করেন। প্রাণটা বড় হু হু ক'[illegible]

ওঠে; কিন্তু মনে মনে আলোচনা করেন, ছিঃ! জামাই বাড়ীতে কি থাকা যায়! লোকে বলবে কি? কেন, এখানেই বা একলা কিসের? দুটা ঝি আছে, পুরাতন বৃদ্ধ গোমস্তা আছে, দু'দুটা দরোয়ান আছে—পাড়া প্রতিবেশীরাও বেশ যত্ন করে। তাছাড়া আমি চ'লে গেলে এ ঘরে বাতি দেবে কে? যতদিন আছি, ততদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ ত জ্বলুক।

বৃদ্ধার সাহস অসীম, তা নইলে এত বড় প্রকাণ্ড বাড়ীতে মাত্র দুটী কৈবর্ত্ত জনযাব সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে পারেন? কিন্তু আজ তিনি রাত্রির অন্ধকারে ঘরের বাইরে এলেন কেন? আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ—বান আসার আশঙ্কাও যথেষ্ট। ঐ যে তিনি আবার দেউড়ী পেরিয়ে মোহন দীঘির ঘাটের দিকেই মন্ত্রমুগ্ধের মত চলেছেন—চোখে পলক নেই, সমস্ত শরীর কণ্টকিত। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার—জনমানবহীন মাঠের উপর দিয়া একাই তিনি আস্তে আস্তে চলেছেন। এর কারণ কি তাঁর মানসিক বিকৃতি, না কোনও অশরীরী অপচ্ছায়ার ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ—কে জানে।

২

পূর্ব্বলিখিত ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে হঠাৎ দুপুর বেলা গোমস্তা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে জানালে, দুর্গাপুর গ্রাম থেকে গৃহিণীর কনিষ্ঠা ভগ্নী জানিয়েছেন যে তিনি পীড়িত, বুঝি জগতের কাছে শেষ বিদায় নিতে হবে—একবার মরবার আগে দিদিকে দেখতে চান—শিবানিকে তাঁর দিদির হাতে সঁপে দিতে না পারলে ম'রেও তাঁর শান্তি হবে না—ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে যেন সত্বর চ'লে আসেন—তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর পথ চেয়ে আছেন। বৃদ্ধার দুই চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। তাঁর এই বোনটার উপর রাগ ক'রেই তিনি তার খোঁজ নেন নি। সেও অভিমান ক'রে আজ একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে দিদিকে দেখতে চেয়েছে। কত আদরের বোন সেই চারু—বাবা মা কত খোঁজ ক'রে মনের মত পাত্র এনে তার বিয়ে দেন। চারুর রূপের খ্যাতিতে বহু পাত্র এসেছিল কিন্তু অবশেষে রমেশকেই তাঁরা মনোনীত করলেন। সকলেই ভাবলে চারুর বাপ মা কি বিয়েই না দিলে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই চারুর অদৃষ্টচক্র ঘুরে গেল—রমেশের রূপগুণ একাধারে প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। খবর পাওয়া গেল সে নাকি কলকাতায় রেস খেলে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিচ্ছে। চারুর সদুপদেশ সে কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। কতদিন আর এমন ক'রে চলে! হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না ব'লে

রমেশ কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল, আজ পর্য্যন্ত তার সন্ধান নেই। চারুর একমাত্র মেয়ে শিবানীর তখন বারো বছর হবে। শিবানীর দাদামশাই দিদিমা এমন কি একমাত্র মাতুল পর্য্যন্ত তখন স্বর্গারোহন করেছেন। চারু এই আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় যেন অকুল পাথারে পড়ল। একদিন পাওনাদারেরা এসে শিবানী ও তার মাকে বাড়ী ছেড়ে দিতে বল্লে, কারণ বাড়ীটা পর্য্যন্ত রমেশ বন্ধক রেখেছিল। দয়া ক'রে কোন জ্ঞাতি শিবানী ও তার মাকে একখানা ঘরে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু খেতে দেবে কে? কাজেই তখন বড় লোক বোন জমিদার গৃহিণীর কাছে চিঠি গেল। বোন পত্রপাঠ চলে আসবার জন্য পত্র দিলেন, চারু কিন্তু স্বামীর প্রতীক্ষায় দুর্গাপুর গ্রাম ত্যাগ ক'রে আসতে চাইল না, কাজেই সেখানেই জ্ঞাতির আশ্রয়ে তারা রইল।

এদিকে জমিদার গৃহিনী নিজেকে বিশেষ অপমানিত বোধ করলেন এবং সেই থেকে শুধু মাসে মাসে টাকা দেওয়া ছাড়া এ পর্য্যন্ত তাঁদের কোন খোঁজ নেন নি। মাঝে চারু একবার তার ভাসুরপোকে দিয়ে তার দিদির কাছে এই অনুরোধ জানিয়ে পাঠিয়েছিল যে শিবানীর বিয়ে—দিদি কি একবার আসতে পারবেন না? দিদি গম্ভীর ভাবে সিন্ধুক খুলে একখানা পাঁচশো টাকার নোট বার ক'রে চারুর ভাসুরপোর হাতে দিয়ে বলেন, "যাক্, "মেয়েটার যে গোপালজীর আশীর্ব্বাদে ভালয় ভালয় বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে, এই ভাল, সুবিধা হয়ত একবার বরকনে আমায় দেখিয়ে নিয়ে যেও। আমার এখান থেকে কি নড়বার উপায় আছে? এই সেদিন নাতনীটার অত অসুখ, বাছাকে তাই একবার দেখতে যেতে

পারলুম না। আর বাপু, যে যেখানে আছে ভাল থাক্‌। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি করা কেন? যাঁর গলায় মালা দিয়েছিলাম তাঁর দৌলতে এক তাঁকে হারান ছাড়া কোন কষ্ট পাইনি। তাঁর ঘরেতেই মরতে চাই, আর বয়েস হয়েছে এখানে ওখানে কোথায় যাব। চারু এখানে এলনা, এলে বেশ সুখেই থাকত; আমার এই এত বড় বাড়ীটা প'ড়ে আছে সেই হত ভাগাটার জন্যে কেন প'ড়ে থাকা সেইখানে। তা যে যা' ভাল বোঝে।" বোনের উপর অভিমানে আর কিছু বললেন না।

সত্যি চারু যদি আজ বোনের কাছে চলে আসত, মৃত্যু বুঝি এত শীঘ্র তাকে আহ্বান করতে এগিয়ে আসত না, কিন্তু বিধাতার অমোঘ দণ্ড, খণ্ডন করে কার সাধ্য? প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার আজ বর্ত্তমান না থাকলেও গৃহিণীর প্রতাপ এ অঞ্চলে কে না জানে? গ্রামের সকলেই তাঁর বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, স্নেহে বশীভূত, অর্থ সামর্থ্য তাঁর প্রচুর। এ হেন দিদির কাছে এলে চারুর না হোক শিবানীর হয়তো একটা হিল্লে হোত। এমন ক'রে হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে হোত না, কিন্তু অভাগিনী চারু যে কত দুঃখে গ্রাম ছেড়ে আসেনি, সে সতীসাধ্বীর অন্তরের ব্যথা এক অন্তর্য্যামী ছাড়া কে বুঝবে? স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় সকল দুঃখকে সে তুচ্ছ করেছে, এমন কি একমাত্র কন্যা শিবানীর কথাও সে ভাবেনি, কিন্তু যার জন্যে এই কঠোর ব্রতপালন, সে আজ কোথায়? আজ চারুর দিদি প্রত্যেকটী ঘটনা যেন চলচ্চিত্রের ছবির মত দেখতে লাগলেন। শেষে স্থির করলেন, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে চারুর কাছে যাবেন। আজ কোন বাধা তার মনকে ধ'রে রাখতে পারলে না—প্রাণ কেবল কেঁদে উঠে বলতে লাগল "চারু তোর

দিদির ওপর অভিমান ক'রে যাসনি। আর তোদের কিছুতেই আমি এমন ক'রে থাকতে দেব না। আমার কাছে কেন এলি না বোন?" চোখের জল আর বাধা মানলে না, দু'চোখ ছাপিয়ে শ্রাবণের ধারার মত জল নেমে এল। গোমস্তাকে বললেন "সরকার মশাই, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে দুর্গাপুর যাব, তার ব্যবস্থা করুন, সঙ্গে আপনি যাবেন, নিধুর মাও যাবে; ঠাকুর মশাইকে একবার খবর দিন। এদিককার সব বুঝিয়ে দিয়ে যাই, যদিই কাল না ফিরতে পারি।

সেইদিনই সন্ধ্যার মৌন আঁধারে একখানি গরুর গাড়ী নিঃশব্দে গ্রামের পথে চল্লো—গোপালজীর মন্দির পার হ'য়ে, মোহনদীঘির মাঠ পেরিয়ে, শিবমন্দিরের পাশে বড় কাঁঠালগাছটার তলা দিয়ে। ক্রমে মাঠের পথে গরুর গাড়ী বৃদ্ধাজমিদার গৃহিণীকে নিয়ে মিলিয়ে গেল। গরুর গাড়ীর ছইএর মধ্যে দুলতে দুলতে বৃদ্ধার মন কেমন যেন উদাস, হয়ে পড়ল। বুঝি বড় দেরীতে, হ্যাঁ বড় দেরীতেই তাঁর বড় আদরের কোলে পিঠে করে মানুষ করা চারুকে শেষ দেখতে যাচ্ছেন—দেখা হবে কিনা কে জানে?

৩

দুর্গাপুর গ্রাম সাদিপুর থেকে বেশী দূরে নয়, প্রায় তিন ঘণ্টার পথ। যখন গরুর গাড়ী এসে গ্রামে পৌঁছুল তখন রাত্রির অন্ধকার গ্রামখানিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নিঃশব্দে গাড়িখানি গিয়ে এক গৃহস্থের বাড়ী দাঁড়াল। বাড়ীর লোকেরা দেখিয়ে দিলে যে, ঐ বাঁশ বাগান পেরিয়ে যে খোলার ঘর দেখা যাচ্ছে, ঐ টাই হচ্ছে শিবানীদের ঘর। বৃদ্ধা দুচোখ বিস্ফারিত করে শুধু চেয়ে রইলেন, অস্ফুট স্বরে বল্লেন, "দেখুন সরকার মশাই আজ রাতটা যে ক'রে হোক কাটিয়ে কাল ভোরবেলা চারুকে নিয়ে একেবারে সাদিপুর যাব। গোপালজী, এ কোথায় আমায় আনলে ? যাক্ যখন এসে পড়েছি।" গাড়ী খোলার ঘরের সামনে থাম্‌ল ; বৃদ্ধা নিধুর মাব সঙ্গে সঙ্গে শিবানীদের ঘরে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই সামনের ঘর খানাতে চোখে পড়ল প্রদীপের স্তিমিত আলোকে শিবানী তার শয্যাশায়িতা মায়ের মুখপানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চারুর গায়ের ও মুখের ঢাকা সরে গেছে, সেই দুটী খোলা পা, সেই নিষ্পন্দ যেন মোম দিয়ে গড়া বাহুবল্লরী, সেই অতুল সুন্দর মুখশ্রী, অর্দ্ধ নিমীলিত দুটী চোখ, ঠোঁট দুখানি পর্য্যন্ত যেন টুকটুক করছে এখনও, সেই মুক্তার মত দাঁত, সেই দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশরাজি, সেই দুর্গাপ্রতিমা, সেই চারু। এখনও পর্য্যন্ত যেন মৃত্যুর করালছায়া তার ওপর পড়েনি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বড় আরামে, বড় শান্তিতে সে ঘুমুচ্ছে।

"শিবানী।" বৃদ্ধা ডাকতেই শিবানীর চমক ভাঙ্গল। সে ভয়চকিত

কণ্ঠে ব'লে উঠল "কে গা? মা কেন এতক্ষণ নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে, একবার দেখ না। ঘুমুবার আগে পর্য্যন্ত বাবা আর মাসীমাকে খুঁজছিল।"

"এইত আমি এসেছি শিবানী। এমন ঘরে মানুষ মরবে না ত কি? কালই তোদের সাদিপুর যেতে হবে। তুই একা তোর রুগ্ন মাকে নিয়ে বসে আছিস? তবে যে শুনেছিলুম তোদের কে এক কাকা তোদের একখানা ঘরে থাকতে দিয়েছে।

"এইত সেই ঘর! তুমিই তবে সাদিপুরের মাসীমা। শীগগীর মাকে একবার দেখ না।"

মাসীমাকে প্রণাম করবার কথাও তার স্মরণে এল না। মাসীমার একখানি হাত ব্যাকুল হ'য়ে ধরে তার মায়ের বিছানার কাছে নিয়ে গেল কাছে গিয়ে বৃদ্ধার আর কিছু বুঝতে বাকী রইল না। তবু একবার চারুর গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। হিম শীতল দেহখানি তার বড় শান্তিতে চিরনিদ্রায় অভিভূত। না জানি মৃতদেহ কতক্ষণ এইভাবে পড়ে আছে! বৃদ্ধা ভয়ে দুঃখে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন, কি করা উচিত ভেবে পেলেন না। শুধু "সরকার মশাই" বলেই চারুর বুকের উপর আছাড় খেয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন "চারু! এই দেখতেই কি আমায় ডেকেছিলি বোন্?

শিবানী আকুল হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে "মাসীমা মা, কেন আজ এত ঘুমুচ্ছে?"

আর মা, হতভাগী মা কি আর আছে"?

"মা গো" তুমি কখন চলে গেলে, আমায় একবার বললে না। আমি ত সকাল থেকে তোমার কাছ ছাড়া হইনি মা।"

শিবানীর কান্নার স্বর শুনে সরকার মশাই ছুটে এলেন; তিনি বাইরের রোয়াকেই বসেছিলেন। এসে জিজ্ঞাসা করলেন "কি হয়েছে মাঠাকরুণ?

তোমাদের মাসীমা কতক্ষণ মারা গেছেন কেউ জানে না।

"কেন এদের সব গেলেন কোথায়? কি ব্যাপার তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

আর ব্যাপার বাবা! আমার বুড়ো বয়সে এ কি শাস্তি। তা হ্যাঁরে শিবানী, এরা না হয় গরীব ব'লে দেখেনা, কিন্তু তোর বর কোথায় গেল? সে ও কি পালিয়েছে নাকি? তোদের এমন অবস্থা, বাড়ীতে কেউ নেই, একি কাণ্ড! আমাকে ত কিছুদিন আগেও একটু জানাতে হয়—কে জানে বাপু, সবই যেন সৃষ্টিছাড়া। এখন ওঠ্ মা, কাঁদবার সময় ঢের পাবি। জামাই রোজ আসে?

শিবানী নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল "না"।

"সে কি রে? তোরা একলা এমন ক'রে কতদিন আছিস?"

"বিয়ের একবছর পর থেকেই।"

"তোর কাকাদের সঙ্গে ঝগড়া নাকি?"

"এক রকম তাই"।

"তা এখন সৎকার হয় কি ক'রে? সরকার মশাই একবার গিয়ে তাদের খবর দিক। আমি এখানকার যে কিছুই জানি না। চারুর কপালে এতও ছিল—মরেছে না বেঁচেছে—যেমন অভিমানিনী ছিল—তার কি এমনি শাস্তি হ'তে হয়—ভগবান!"

ইতি মধ্যে একটী বর্ষিয়সী বিধবা সঙ্গে দুটী যুবক, রোয়াকে এসে দাঁড়ালেন স্ত্রীলোকটি বল্লেন "হ্যাঁ লা শিবানী, তোর মা ত আমাদের হাড়ে নাড়ে জ্বালালে। তুই ও ত বাপু কম নিমকহারাম মেয়ে নস্। যেমন বাপ মা তেমনি হবে ত? বলি মায়ের যে এতটা অসুখ তা একবার জানাতে হয় ত?

শিবানীর মাসীমাই উত্তর দিলেন "ভাই ও তো ছেলে মানুষ, ওকি জানে বল? মা যে মরে গেছে বাছা তা পর্য্যন্ত টের পাইনি আমি এইমাত্র এসে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছি—এই সোমত্ত মেয়ে ঐ রোগী নিয়ে একলা—জামাই কোথায়, কাকারা কোথায়, শিবানী ত কিছুই বলতে পারে না।"

আগন্তুক মহিলাটী বল্লেন "সে অনেক কথা ভাই! এখন সৎকারের ব্যবস্থা ত হোক্। ওরে সতু, যা তোদের বাপ কাকাকে ডেকে আন্, তোদের কাজ তোরা কর; মরেও শত্রুতা করতে হয় দিদি; কি বোন্ তোমার সকল দিকে মাথা হেঁট করাল আমাদের।

শিবানীকে অতিকষ্টে ভুলিয়ে সে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হোল। মৃদু হরিধ্বনি সহ চারুর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল, সারা গ্রামখানিকে সচকিত ক'রে শুধু শিবানীর মা মা চীৎকার শোনা যেতে লাগল। আজ কেউ তাকে বোঝাতে পাচ্ছে না—সে যে কত হত ভাগিনী। মা কাকাদের হাতে পায়ে ধরে বিয়ের ব্যবস্থা করলে—বিয়ে যদি বা হ'ল শাশুড়ীর অত্যাচার, স্বামীর অবিবেচনা, শ্বশুর বাড়ীতে নিত্য বাক্য যন্ত্রনা ও প্রহারের জ্বালা তার অসহ্য হ'য়ে উঠল—শুধু কি তাই, লাঞ্ছনা গঞ্জনা তার উপর আবার অপবাদ। কিন্তু এ অপবাদ কেন? এ অপবাদ কি মিছে? না একেবারে মিছে নয়। স্বামীর অত্যাচার প্রহার যখন চরম সীমায় উঠল, তখন স্বামীর এক জ্ঞাতি ভাই, নাম তার নরেন, সে এসে শিবানীকে বাঁচায়। তাতে সকলের রাগ পড়ল নরেনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রিতেই শিবানীকে ঘরের বার ক'রে দেওয়া হ'ল। নরেন শিবানীকে নিজগৃহে নিয়ে গেল; নরেনের বৃদ্ধা মা ও বিধবা বোন শিবানীকে পরিচর্য্যা ক'রে বাঁচাল। শিবানী চারদিন শারিরীক ও মানসিক কষ্টে বিছানা থেকে উঠতে পারলে না; যখন উঠে বসল তখন প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ভাবতে লাগল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের উপরে যেন আরও একটা কি আছে, যা শিবানীকে সংসার ধর্ম্ম স্বামী, কর্ত্তব্য সমাজ সব ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। নরেনের মনুষ্যত্ব, প্রাণঢালা ভালোবাসা। যত্ন সে যেন কিছুতে ভুলতে পারছে না—মনে

হচ্ছে জগতের সব সুখের বিনিময়ে সে যদি এই নরেনের বাড়ীতে কি হ'য়ে থাকতে পারে, তার চেয়ে সুখ বুঝি শিবানীর আর কিছু নেই। ভালবাসার অপ্রতিহত বেগ তাকে আজ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সে আর ভাবতে পারে না, অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ে, কিন্তু বেশীক্ষণ শুতে হল না, নরেনের মার কণ্ঠস্বর তার স্বপ্ন ভেঙে দিল। পাশের ঘরে নরেন ও তার মার কথা শুনে শিবানীর চমক ভাঙল। সে শুনতে পেলে, নরেনের মা বলছেন, "নরেন তোর জ্বালায় কি আমি আত্মহত্যা ক'রে মরবরে?" গ্রামে যে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, মুখ দেখান ভার, কেন বল দিকিন? যাদের জিনিস যাদের বউ তারা মারুক, কাটুক, রাখুক, তোর কি? তোকে কে সর্দ্দারী করতে বল্লে?"

নরেন বল্লে "মা, রোজ রোজ এই অত্যাচার চোখে দেখা যায় না। তোমার ছেলে কি মানুষ না জানোয়ার, মা? লোকের কথায় কান দিও না। ওরা চায় একটা মুখরোচক হুজুগ। আমি না গেলে ওকে ওরা মেরেই ফেলত।"

"ফেলে ফেলত! আপদ যেত। অমন স্বামী যার তার আবার বাঁচা কেন? গোটাকতক ছেলে পুলে হ'য়ে তারপর ছুঁড়ী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরুক এই ত? ওদের মত চামার কেউ আছে নাকি? ওদের প্রাণে দয়া মায়া ব'লে কিছু নেই। শিবানীর মায়ের যেমন, আর পাত্র পেলে না। সে এখন যাই হোক্, ওকে এখুনি ওর মায়ের কাছে রেখে এস। আমি কোন কথা শুনব না, শেষে কি পুলিস হাঙ্গামা হবে?

নরেন বল্লে, "মা, তুমি একি ব'লছ? ও যে এখনো উঠতে পারছে না। তুমি ত এমন নিষ্ঠুর ছিলে না মা।"

"না বাবা, আমি আজই নিষ্ঠুর হয়েছি। সমাজে বাস করতে হ'লে সমাজের নিয়ম মাথা পেতে নিতে হবে। মেয়েটার ত সর্ব্বনাশ হ'লই —তুই যদি ওকে না বাঁচাতে যেতিস্, তা'হলে বোধ করি এতটা বিপদ শিবানীর হ'ত না! তোর জন্যই ওর সর্ব্বনাশ তা জানিস্।

"মা তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, এ সমাজ আমি চাই না— যেখানে নিরীহ স্ত্রীলোককে বিনাদোষে রাতদিন যন্ত্রনা দেওয়া হয়, তীব্র গালাগাল দিয়েও আশ মেটে না, আবার প্রহারও করে। যত সব জানোয়ারেরও অধম। ছি ছি এর ওপর আবার অপবাদ।"

"যা যা, ভারী কর্ত্তা হয়েছিস্ বলি—"

আর কিছু বলতে হোল না, শিবানী টলতে টলতে উঠে এসে বল্লে "আমি আজ এখুনি যাব—আপনাদের দয়া ভুলতে পারব না—আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে মার কাছে যাব, ভিক্ষে করে খাব, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে আপনাহতেই তা হয়ে গেল। মিছে আপনাদের কষ্ট হোল এই যা।"

নরেনের মা একরকম খুসী হ'য়ে গেলেন মনে মনে ভাবলেন যাক্ বাবা, বেনো জল ঘরে ঢুকে ঘরো জল বুঝি বেরিয়ে যায়। মুখে বললেন "হ্যাঁ মা, তুমি এস। আমাদের আবার প্রতিবেশী, তায় জ্ঞাতি। মিছে একটা মনোমালিন্য বিবাদ কেন? যদিও এ যা ঘটল তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ঝগড়া চলবে। নরেন ত প্রায়ই এক একটা হাঙ্গামা নিয়ে আসে।"

এতক্ষণে নরেন মুখ তুলে চাইলে। শুধু অস্ফুটস্বরে বল্লে, "আজ যেতে পারবে? এখান থেকে ত দুর্গাপুর কমখানি দূর নয়!"

শিবানী দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে "খুব পারব, এখুনি যাব। কিন্তু কে রেখে আসবে?"

নরেনের মা বেজার হয়ে বল্লেন, "কে আবার, যে এনেছে সেই তা এইবেলা গেলে সন্ধ্যার সময় পৌঁছাবে।"

শিবানী তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হল। গিন্নি বল্লেন, "কিছু খেয়ে নাও বাছা।"

শিবানী বল্লে, "না মা, খিদে নেই।" "নরেনেরও জল খাবার ঢাকা প'ড়ে রইল।"

৫

শিবানী পাল্কীতে উঠল, নরেন হেঁটেই চল্লে। গ্রাম ছাড়িয়ে যখন দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে এসে তারা প'ড়ল, তখন শিবানী পাল্কীর দরজা ফাঁক ক'রে উঁকি মেরে নরেনকে বল্লে "আমার জন্য কত কষ্ট হ'ল আপনার, এতটা পথ হাঁটতে হচ্ছে। কেন আপনি আমায় আনতে গেলেন ?"

তার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হ'য়ে উঠল, আর কিছু বলতে পারলে না। পাল্কী বেয়ারারা একবার পাল্কী নামিয়ে একবার পুকুরে জল পান করতে গেল। শিবানীর দুই চোখ তখন জলভরা, উদাস দৃষ্টিতে দূরে মাঠের পাশে সব ঝাপসা দেখছে। নরেন শুধু জিজ্ঞাসা করলে "শিবানী তোমার স্বামীর কথা মনে পড়ছে না ?"

"হ্যাঁ খুব পড়ছে,"—শিবানী উত্তর দিলে।

"তবে ফিরে যাবে ?"

"কেন মার খেতে ?"

"আচ্ছা ও কোনদিন তোমায় যত্ন আদর করেনি ?"

"মনে পড়ে না, হয়ত করেছেন, আমার মনে কোন দাগ নেই।"

বিস্মিত কণ্ঠে নরেন বল্লে—"সে কি স্বামীর মার গালাগাল ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না ?"

এত দুঃখেও ম্লান হেসে শিবানী বল্লে—"কেন স্বামীর কাছে আর যেতে পাবো না ব'লে আপনার দুঃখ হচ্ছে নাকি ?"

"না—ঠিক তা নয়। তবে স্ত্রীলোকের এর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই শুনেছি।"

মৃদু হেসে শিবানী বল্লে—"না তা কেন হবে।"

তবে—"হ্যাঁ, ছেলে পুলে হ'লে কি এমন করে চলে আসতে পারতাম? ভাগ্যিস্, ভগবান বাঁচিয়েছেন। নিজের জন্য একটুও ভাবি না। আঃ, আজ আমার মুক্তি। আচ্ছা স্বামীর বিরুদ্ধে নিন্দা করলে পাপ হয়, না?"

"বোধ হয়, অন্ততঃ হিন্দুশাস্ত্রে তাই বলে।

"তবে আর বলব না, কিন্তু স্বামীকে যদি কিছুতে ভালবাসতে না পারা যায় তা হ'লেও কি পাপ হয়?"

"পাপপুণ্য যিনি সৃজন করেছেন শিবানী এ প্রশ্নের মীমাংসাও তিনিই করবেন; আমি এ সবের বাইরে চলে গেছি।"

"তার মানে?"

মানে তুমি বুঝবে না শিবানী, বুঝে দরকারও নাই, কিন্তু শুধু এইটুকু জানি, মনে হয় তুমি বড় আপনার। কেন এমন হয় জানি না। যেদিন থেকে তোমায় দেখেছি সেদিন থেকে বুঝেছি...থাক্ সে কথা। শিবানী, আমায় ক্ষমা কর, তুমি পরস্ত্রী, তোমাকে এসব কথা বলা ভারি অন্যায় হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি শুধু আমায় তোমার ভাই ব'লে মনে করতে পারবে কি?"

শিবানী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইল। আবার পাল্কী চল্লো।

তখন দিনের আলো প্রায় নিভে গেছে, গাছে গাছে পাতায় পাতায় পুকুরের কালো জলে বুঝি তখনও সূর্য্যের শেষ রশ্মির আভাস রেখে গেছে। দিবা অবসানে যে যার বিশ্রাম অন্বেষণে চলেছে। ঐ নেড়া

পাগল বৈরাগী সারাদিন গান গেয়ে এইবার ফিরছে। তার গানের শেষ নেই কি ?

এখনো গান চলেছে—

কতকাল থাকব ব'সে দুয়ার খুলে বঁধু আমার,
কি নিয়ে থাকব বলো তুমিই যদি রইলে ভুলে।
কত যে মনের কথা, কত যে প্রাণের ব্যথা—"

আর শোনা যায় না, শিবানীর হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। সত্যি, কিছুই ত বলা হল না। কেন বলবার জন্য প্রাণ এমন আকুল হ'য়ে উঠেছে। নরেন আমার কে ?

"গ্রামের ভেতর পাল্কী এসে পড়ল। নরেন আর একবার শিবানীকে ডেকে বল্লে "শিবানী কি ভাব'ছ ? মা যা বললেন তা বোধহয় মিথ্যে নয়। সত্যিই হয়তো আমি তোমার ভাল করতে গিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ করে বসলাম। কোথাও তোমার মুখ দেখাবার যো থাকবে না।"

"কেন, আমি কি করেছি ? শিবানী প্রশ্ন করল।

"সে কথা কে বুঝতে চাইবে ? তুমি কি করেছ ? আমার সঙ্গে স্বামীগৃহ ছেড়ে একাকী চলে এসেছ, এর ছেয়ে বড় আপরাধ আর কি আছে ? আমার কথা পেনসিলের দাগের মত মুছলেই উঠে যাবে, কিন্তু তোমার কথা লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকার মত, তা ভেবে দেখেছ ?

শিবানী বল্লে "ভাবতে চাই না। আমি জানি তোমার চেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী জগতে আমার আর কেউ নাই। তোমায় এত আপন বলে মনে হয় যে আজ থেকে তুমি বলে সম্বোধন করতে একটুও বাধছে না। বিয়ে হবার পর থেকেই তোমার যত্ন আমার শ্বশুর বাড়ীর একমাত্র

আকর্ষণ ছিল। তুমি যেদিন আমাদের বাড়ী না আসতে সেদিনটা যেন বৃথা যেত। তোমার দাদা মাঝে মাঝে কি বলতেন জান? বলতেন দেখ নরেন আর তোমাকে বেশ মানায়, ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লে বেশ হত না? "মনে মনে খুব সুখী হতাম, কিন্তু মুখে বলতাম "ছিঃ, বলতে নেই।" সব সময়ই তাঁর মেজাজ খারাপ থাকত না, আর মারধোর করলেও খানিক পরেই আবার ভুলে যেতেন। কেমন এক প্রকৃতির মানুষ। যাক্ সে কথা। অপবাদ যদি কেউ দেয় ত সেই দেবে, কিন্তু আমি যদি সেখানে ফিরে যাই; আর অপবাদ দেবে না; কিন্তু না গেলে —থাক্ সে আর ব'লে কাজ নেই।

শিবানীর একথা শুনে নরেন বল্লে, "তবে এলে কেন? এখুনি ফিরে চল, ছিঃ একথা আগে বলতে হয়।"

চলে এলাম কেন? অপবাদ মাথা পেতে নেব ব'লে। আমার ত ছেলে মেয়ে নেই যে বিয়ে দিতে হবে। আর ধর্ম্ম? সে বিচার যেখানে হয় সেখানে হবে। কর্ত্তব্য অনেক ছিল, পরেও আছে। সকলের কর্ত্তব্য পালন করবার শক্তি থাকে কি? দুঃখ করবার ভেতর আছে একমাত্র মা। যেমন তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছিলেন তেমনি এখন একটু শাস্তি পান। তা সে যাক্—তুমি কি এদিকে আর আসবে না? আর কি দেখতে পাব না?

"নিজেকে বেঁধে রাখবার শক্তি অনেকদিন হারিয়েছি শিবানী। কিন্তু তাতে তোমার মাথা হেঁট হবে না?

"কেন এত যদি বাধা থাকে, তবে ছোট বোন মনে ক'রেও একবার দেখা দিয়ে যেও। আমি তা নইলে কি ক'রে বাঁচব ব'লে দাও। স্নেহ ভালবাসা কি সব সময় গণ্ডীর ভেতর থাকে?"

"না তা নয়। তবে লোকে, সমাজ ত তা বুঝবে না। তুমি কত পবিত্র মিছে কেন আমার জন্ম কলঙ্ক কেনা ?

"নিজে যদি নিজের মাথা ভাঙ্গি, তাতে তুমি করবে কি ?"

"ঐ যে তোমাদের ঘর দেখা যাচ্ছে। শিবানী, আমি আর বেশীদূর যাব না—এখানে দাঁড়াই তুমি যাও। ভগবান তোমার সহায় হোন, এর বেশী আর কিছু বলবার নেই।"

নিঃশব্দে পাল্কী গিয়ে শিবানীদের ঘরের সামনের উঠানে শিবানীকে নামিয়ে দিল। শিবানীর মা তুলসী তলায় সবে মাত্র প্রদীপ দিয়ে গড় হ'য়ে বুঝি ঠাকুরের কাছে শিবানীর মঙ্গল কামনা করছিলেন, এমন সময় "মা" ডাক শুনেই চমকে উঠে দেখেন অন্ধকারে শিবানী দাঁড়িয়ে। মা একটুও ভয় পেলেন না, চমকালেন না—শুধু ম্লান হেসে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মুখখানা তুলে বললেন "ছিঃ মা স্বামীর ওপর রাগ করতে আছে নরেন কি পৌঁছে দিয়েই চলে গেল ?"

শিবানী মৃদুকণ্ঠে বল্লে "না মা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"সে কি রে কুটুমের ছেলে পথে দাঁড়িয়ে কেন।" বলেই উঠান পেরিয়ে খিড়কীর দরজার কাছে গিয়ে ডাকলেন, "নরেন, ভেতরে এস বাবা।"

নরেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে শুধু ভাবলে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে বুঝি শুভবার্ত্তা এখনো পৌঁছায়নি—তবু ভাল। সাহসে ভর ক'রে সে এগিয়ে এসে শিবানীর মাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। শিবানীর মায়ের মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নেই, শুধু হেসে বললেন "তোমার দাদার কাছ থেকে কি শিবানীকে কেড়ে নিয়ে আমাকে দিতে এলে বাবা ? তার জিনিষ, সে মারুক, কাটুক, রাখুক আমার ত কোন জোর নেই। কাল

শশধর এসেছিল, বলে গেল তোমাদের ছেলে মানুষীর কথা। আর জানিয়ে গেল "ও যদি ফিরে আসে এখানে, তৎক্ষণাৎ তাকে আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, না হয় খবর দেবেন, আমি নিয়ে যাব শিবানীর বড় রুক্ষ মেজাজ, সেজন্য কারুর সঙ্গে বনে না, প্রায়ই গোল বেধে যায়। আর নরেনের সব তাতেই বাড়াবাড়ি, চিরদিনই ঐরকম গোঁয়ার, বোন বিধবা হয়েছে বলে এখন পর্য্যন্ত বিয়ে করেনি "যা হবার তা হয়ে গেছে শিবানীকে কিন্তু কাল ফিরে যেতেই হবে।"

শিবানী সব শুনে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। নরেন যথারীতি কথা ব'লে খানিক পরেই সন্ধ্যার আঁধারে বেরিয়ে পড়ল গৃহ অভিমুখে।

৬

শিবানী তার পর দিন আলতা সিঁদুর প'রে, মায়ের বুক খালি ক'রে, মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজেকে বলি দিতে চ'ল্লো আবার সেই কারাগৃহে, যেখানে নিশ্বাস ফেলতেও বুকে লাগে। যাবার সময় আজ শিবানী একটুও চোখের জল ফেললে না। কিন্তু কিছুদিন পরেই একদিন রাতে শিবানী ফিরে এল কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে। গ্রামে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, শিবানী নাকি নরেনের সঙ্গে একলা পালিয়ে এসেছে—শিবানীর স্বামী নিজে বলে বেড়িয়েছে যে শিবানীর চাল চলন ভাল নয় বলেই নাকি তাকে এরূপ শাসন করা হোত—সে অনেক কথা—শিবানীকে আর ঘরে নেওয়া হবে না। শিবানীর মা শিবানীকে বল্লেন "সর্ব্বনাশী তোর মনে এই ছিল ?" আমার পেটের মেয়ে হয়ে তুই কিনা বংশের মুখে চুন কালী দিলি।" সেইদিন থেকে তিনি শয্যা নিলেন। শিবানী মাকে ব'ললে "মা, তোমার মেয়ে তোমার মত সতী না হ'লেও অসতী নয়।" তবুও শিবানীর মাকে ও শিবানীকে একঘরে হ'য়ে থাকতে হল।

শিবানীর মা চাঁরু এই দারুণ আঘাত সহ্য ক'রতে পারলেন না। মাঝে মাঝে নরেন শুধু এসে খোঁজ নিয়ে যেত। দুদিন আগেও নরেন কবিরাজ সঙ্গে করে এনে দেখে গেছে, আজ কেন এল না কে জানে ? আজ বুঝি সব শেষ। নরেনের এখানে আসাও বুঝি আজ থেকে শেষ হল।

শিবানীর মাসীমা শিবানীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই শুনলেন ; তারপর দিন ভোরবেলা শিবানীদের বাড়ীতে আর কাউকে দেখা গেল না। সব শূন্য পড়ে রইল, শুধু শিবানীর পোষা বেড়ালটা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ী থেকে কে ব'লে উঠল' "দূর, দূর, অলক্ষুণে বেড়াল কোথাকার !"

শিবানীদের নিয়ে গরুর গাড়ী যখন দুপুর রোদ্দুরে মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে শিবানীর মাসীমা একপাশে শুয়ে আগাধ নিদ্রায় অভিভুত, নিধুর মা ও তাই ; শুধু সরকার মশাই স্থির হ'য়ে গাড়োয়ানের পিছনে চুপ করে বসে আছেন। এমন সময় নরেন ঝড়ের মত কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে ঘর্ম্মাক্ত দেহে এসে দূর থেকে একখানা চিঠি গাড়ীর মধ্যে ফেলে দিয়ে আর্ত্তস্বরে বলে উঠল "শিবানী চলে যাচ্ছ ?"

শিবানী কিছু বলতে পারলে না, শুধু চারিদিকে চেয়ে চিঠিখানা তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে, কিন্তু তা সরকার মশাইএর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি বল্লেন "ছেলেটী কে ? "গাড়োয়ানকে থামতে বলব ?"

শিবানী ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে "না, না, শীগ্‌গীর চলুন। দূরে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে নরেন অনিমেষ নয়নে গাড়ীর দিকে চেয়ে আছে, যেন প্রাণহীন পাষাণ মূর্ত্তি। শিবানী "উঃ" বলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার মনে হল তার মত আজ এমন সর্ব্বস্বান্ত কে আছে ? মাকে হারিয়ে আবার নিজেকে এমন ক'রে হারান। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলতে লাগল "মা, মা, মাগো, আমায় তোমার কাছে টেনে নাও। এখান থেকে

আমার প্রাণ যে যেতে চায় না মা। তোমার পাশে কি একটু জায়গা আমার হোল না মা।"

শিবানীর মাসীর এতক্ষণে হুঁস হল যে শিবানী যেন বড় আকুল হ'য়ে কাঁদছে। আলিঙ্গি ভেঙ্গে উঠে ব'সে বললেন "ও শিবানী, ওমা ওঠ্ বাছা, কাঁদিস্‌নে, কেঁদে আর কি হবে? তোর অদৃষ্টের লিখনই এই রকম। তোর বরাতে থাকে ত আবার তোর শ্বশুর বাড়ী থেকে তোকে নিয়ে যাবে। ঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস রাখ্। সব একদিন ফিরে পাবি।"

শিবানীর যেন কারো কোন কথা কাণে পৌঁছায় নি; তার বুকখানি নিরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে থেকে থেকে গুমরে উঠ্‌ছিল। কে বুঝবে তার অন্তরের ব্যথা, কেন সে কাঁদে? মাকে হারিয়েছে আর—আর—জীবনের শেষ আলোটুকুও বুঝি আজ নিভে গেল—কিন্তু—না, এখনও হৃদয়ে ক্ষীন দেউড়ীর মত আলো যেন মানস চক্ষে দেখা যায়। ঠাকুর দেবতা কে আছে গো—কে তাকে বলে দেবে—সত্যিই কি সে আবার ফিরে পাবে? কিছুই ত সে চায় না, দিনান্তে শুধু একবার চোখের দেখা, সে টুকুও কি নির্ম্মম নিয়তি এসে ভেঙ্গে দিয়ে গেল? কেন, কেন এমন হয়? স্বামীর কাছে থাকলে হয়তো ভালই হত। কেন সে সহ্য করতে পারলে না? কষ্ট ক'রে থাকতে পারলে বুঝি একবার দিনান্তে শুধু চোখের দেখা দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হত। কেন এ ভুল করলে? চিরদিনের মত বুঝি শ্বশুর বাড়ীর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। আজ অনেকদিন পরে তার বাপকে মনে পড়ল, তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন? মা কিন্তু বলতেন, হ্যাঁ আছেন, আমি যদি মরি আমাকে যেন সধবার

বেশে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।' কিন্তু সকলের কাছে তাঁর বিষয়ে যা শোনা যায় তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায় না। কত কথাই শিবানীর মনে পড়তে লাগলো। অতিরিক্ত শারিরীক কষ্টেও অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় তার দেহ ও মন দুই ই একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। আবার তার মায়ের কথা মনে পড়াতে সে ভাবতে লাগল, আহা, আমার দুখিনী মা, বাবার পথ চেয়েই শেষ নিশ্বাস ফেললে, আমিও যদি মায়ের মত অমনি স্বামীকে শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতে পারতাম, তা হ'লে আমার মত সুখী আজ কে? কিন্তু কেন পারলাম না? কেউ কি পারে? কেন পারি না কে বুঝবে? কে শুনবে? তাহার কারণ শুধু কি প্রহার, না আরো কিছু? ভদ্রলোকের ঘরে এমন নীচ ভাষায় গালাগালি এমন তীব্র উক্তি। উঃ, আমার শ্বশুর বাড়ী চাই না, তার চেয়ে ভিখারিনী হওয়া শতগুণে ভাল। কিন্তু মা সর্ব্বদা বলতেন "শিবানী, আমার মত স্বামীর স্নেহ যেন সকল স্ত্রীলোক পায়। তিনি ত আমায় কোন দিন কষ্ট দেন নি, লোকে তা না বুঝে নানা কথা বলে। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। তিনি যে কত কষ্টে কত দুঃখে দেশত্যাগী হয়েছেন সে আমি জানি আর জানেন সেই অন্তর্য্যামী।"

সত্যিই হয়ত তাই, তা না হ'লে মা সকল সুখ তুচ্ছ করে কার প্রতীক্ষায় শেষে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন? সে কি এই একমাত্র ঐকান্তিক স্বামী প্রেমের নিদর্শন নয়? শিবানীর অদৃষ্ট!! হায়রে' প্রেমের একটী কণাও পেলে সে যে ধন্য হ'য়ে যেত। শুধু একটু প্রেম, একটু ভদ্র ব্যবহার, একটু সহানুভূতি, একটু সহৃদয়তা

বেশী ত সে চায় নি। কিন্তু শিবানী আজ কার জন্য সকল দুঃখ ভুলে কার কথা ভাবছে? চোখের সামনে কার মুখ ভেসে উঠ্‌ছে? সে মুখ কি ভুলতে পারা যায় না? একবার তার মনে হ'ল নিজের মাথা খুঁড়ে মরে। কেন তার এমন মতিভ্রম হ'ল? স্বামীকে ভালবাসতে না পারলে তার নরকেও স্থান হবে না। আবার অন্যকে ভালবেসে তার দুঃখের শেষ নেই। নরক কি এর চেয়েও কষ্টকর? কিন্তু তার প্রাণ থেকে সে যেন ব'লে উঠ্‌ল ভগবান তুমি আমাকে নরকে নিক্ষেপ কর, কিন্তু শুধু দূর থেকেও তাঁকে দেখতে দাও, ব'লে দাও কি ক'রে তাঁকে দেখতে পাবো? তার ভয়ানক ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল গরুর গাড়ী থেকে নেমে এক দৌড়ে ছুটে যায়, কিন্তু কোথায়? শিবানী কেঁদে কেঁদে বড় শ্রান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

৭

সাদিপুরে পৌঁছে শিবানীর মাসীমা তাকে হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে গেলেন। দুদিন পরে শিবানী, যথানিয়মে মায়ের চতুর্থী শ্রাদ্ধ করলে। গভীর নিস্তব্ধ রাতে যখন সবাই ঘুমে অচেতন, শিবানী আস্তে আস্তে উঠে তক্তপোষের নীচে থেকে সন্তর্পণে প্রদীপ বার করে জ্বালালে জ্বেলে বুকের ভেতর থেকে নরেনের লেখা চিঠি খানি এতক্ষণে বার ক'রে পড়তে লাগল। নরেন লিখেছে—

"শিবানী, এই মাত্র তোমাদের বাড়ী থেকে ফিরছি। তোমার মা জন্মের মত চ'লে গেলেন, স্বচক্ষে দেখে এলাম। আমি বড় অক্ষম, বড় হতভাগ্য—আমার স্থূলভাবে কোন অধিকার তোমার উপর নাই, তাই জোর ক'রে নিজেকে ফিরিয়ে আনলাম। তবে তোমার মাসীমা এসেছেন জেনে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম; তোমার একটা আশ্রয় হল। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমি রাতদিন ভগবানকে ডেকেছি যে শিবানীর আশ্রয় আমি যেন উপলক্ষ হয়ে ভেঙ্গে দিলাম—ওর যেন আশ্রয় হয়। জীবনে আর বুঝি কিছু কামনা নেই। তুমি হয়তো তোমার মাসীমার সঙ্গে চ'লে যাবে, হয়তো আর তোমায় দেখতে পাব না। দেখতে পাব না কি? হ্যাঁ, সূক্ষ্মভাবে আজীবন তোমারই মূর্ত্তি মানস মন্দিরে অর্চ্চনা করব। যদি ভগবান্ সত্যিই থাকেন তবে একদিন তোমায় পাব, এই আশা নিয়ে বেঁচে থাক্‌ব।

তুমি একমাত্র ভগবানকে ডাক্‌তে শেখ, তাঁকে পেলে আমাকেও পাবে। আমি জানি তুমি জন্ম জন্মান্তরে আমার। সমাজ, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য কিছুই আমার মনের সঙ্কল্পকে বাধা দিতে পারবে না। বিশুদ্ধ প্রেম একদিন তোমাকে আমাকে চির শান্তিময় রাজ্যে পৌঁছে দেবে। দুদিনের জন্য স্থূলভাবে নাই বা পেলাম। মাতৃআজ্ঞা, আমাকে বিবাহ করতেই হবে। কাউকে ঠকাবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সবই নিয়তি। দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য পালনে এতটুকু ত্রুটী হবে না। ভগবানের শরণ নেওয়া ছাড়া এ হৃদয়ে শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। স্থূলভাবে যখন পাব না, বৃথা দুঃখ করা কেন? কিন্তু সূক্ষ্মদেহে পাবার আশায় বুঝি চিরজীবনে কি এক দুঃসহ দহনজ্বালা সহ্য করতে হবে। কিন্তু তবুও মনে হয় "না, না, তবু—

এই দুঃখ বাঁচিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে
আমি লভেছি যদি—এ বিরস জীবন, সরস লভিব মরণে।

স্থূলভাবে পরস্পরকে কতদিন পাব? তারপর সেই বিচ্ছেদ, সূক্ষ্মভাবে পেলে বুঝি আর কখনও বিচ্ছেদ হয় না। মনে হয় কি এক অভিশাপে আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছে, আবার একদিন আমাদের মিলন হবে।

একটা গুজব শুনছি তোমার স্বামী নাকি পুনরায় তোমাকে আনতে যাবে। জানিনা, কতদূর সত্যি, তবে মনে হয় সেখানে ফিরে যাওয়াই তোমার শ্রেয়ঃ। হয়তো জিজ্ঞাসা করবে হঠাৎ মনের এ বিকার কেন, তার অনেকগুলি কারণ আছে। আরও একটী কথা বলছি, মনে কষ্ট কোরো না, স্ত্রীলোকের ভেতর এমন তেজ, মনের বল থাকা চাই যে কেউ তাকে

অপমান করতে সাহস না করে, গায়ে হাত তোলা ত দূরের কথা। মুখের আস্ফালন অনেকেই করে, তোমার উপর তোমার স্বামী যখন সত্যিই অত্যাচার করতে আসত তুমি যদি একটু রুখে দাঁড়াতে অত না কেঁদে অত না ভয় পেয়ে শুধু একটু মনের জোর দেখাতে পারতে শিবানী তবে কখনই সে তোমার গায়ে হাত তুলতে পারত না। সেও মানুষ, তুমিও মানুষ। সে কি শুধু সবল বলে তোমার উপর অত্যাচার করবে? যদি কখনও ফিরে আস মনের বল না হওয়া পর্যান্ত স্বামীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করো না, এইটুকু অনুরোধ। যাক্ এখন তোমায় বেশী লেখা হয়তো অনুচিত, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কি এক স্বপনের ঘোরে দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এ সোণার স্বপন বোধ হয় ভেঙ্গে যাবে। কেন প্রাণ কেঁদে উঠছে জানি না। তোমায় অনেক কথা লিখলাম বটে, কিন্তু সব সময় নিজের মন বশে থাকে না এই দুঃখ। বাসনা, কামনা সব সেই মঙ্গলময়ের চরণে সমর্পণ করলাম। যাবার বেলা শুধু এইটুকু জানিয়ে যাই যে তোমায় কত ভালবাসি। ভাষায় বোঝাবার শক্তি নেই; যদি শানিত ছুরিকাঘাতে হৃদয় চিরে দেখাতে পারতাম, তবে শোণিত রেখায় যে লেখা ফুটে উঠত সেই লেখায় সেই রক্তের ভাষায় বুঝতে আমি তোমায় কত ভালবাসি।" আমি জানি শুধু তব লাগি প্রাণ, মরিছে দহিয়া নিশি দিনমান।" আর না শিবানী—চললুম। ইতি—

হতভাগ্য নরেন।"

শিবানীর তন্ময়তা এক নিমেষে টুটে গেল। দেখলে মাসীমা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন।

৮

শিবানীর মাসীমা বিছানায় উঠে বসলেন, শিবানী এতক্ষণ কোন রাজ্যে ছিল? মাসীমা কঠোর স্বরে বললেন "হতভাগী, এত রাতে ব'সে ও কার চিঠি পড়ছিস্? শীগগীর বল্—তোর সব কাণ্ড শুনেছি—তুই কি মনে করেছিস্, তোর মার মত আমি আমার বাড়ীতে তোদের এই অবৈধ প্রেমলীলা চলতে দেব? এখন মনে হচ্ছে তোর মার সঙ্গে তোকেও সেখানে—" বলতে বলতে বৃদ্ধা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে ফেললেন। আবার বল্লেন শিবানী, দোহাই তোর, সে ছোঁড়া যেন এখানে না আসে। তাহ'লে আমার মুখ দেখান দায় হবে, আমার এত বড় মুখ হেঁট করিস নে, দোহাই তোর শিবানী, না হয় আজ ভোরেই কেউ তোকে রেখে আসুক। ছিঃ ছিঃ আমাদের পেটের মেয়ে এমন হয় কি ক'রে? গোপাল। এ কি শাস্তি আমার! এ মুখ রাখি কোথায়!"

হঠাৎ বৃদ্ধা উঠে এসে শিবানীর দুই হাত ধ'রে আকুল হ'য়ে বলতে লাগলেন, "শিবানী, তুই এত অবুঝ কেন? সে ছোঁড়ার কি? ও দুদিন অমন প্রেমের ভাণ সবাই করে, ওদের এই পেশা। সে দিব্যি বিয়ে থা' ক'রে সংসার করবে দেখে নিস্—তোকে ভুলেও মনে করবে না—এইই পুরুষের রীত। তুই অবুঝ, তাই দুটো প্রেমের কথা শুনে নিজের সর্ব্বনাশ করলি। এখনও পথ আছে, আমি যদি ব'লে ক'য়ে জামাইকে এখানে আনি, হাতে কিছু গুঁজে দিই, তোকে মাথায় ক'রে নিয়ে যাবে। স্বামীর চেয়ে বড় মেয়েমানুষের কেউ থাকতে নেই।

ছিঃ ছিঃ তোর এমন প্রবৃত্তি কেন হল? চল্ এখুনি ঠাকুর ঘরে, গোপালের পায়ে হাত দিয়ে বলবি চল্ যে ভুলেও আর এ পথে যাবি না, তা যদি না করিস এখুনি আমার চোখের সাম্‌নে থেকে দূর হ'য়ে যা।"

মাসীর অনর্গল বকুনি শিবানীর কাণে বুঝি কিছুই পৌছায়নি। মাসীমা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "শিবানী, তোর গলায় দড়ি জোটে না? তোর মা তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছে, তাই এত শুনেও তোকে বুকে করে এনেছি। আমার মুখ রক্ষা কর। এখন ঠাকুর ঘরে যাবি? শিবানী কি ভেবে বল্লে "যাব চল"।

"হাতে কি চিঠি আছে দে"।

"এই নাও, চল ঠাকুর ঘরে। মাসীমা আমি কোন অন্যায় কাজ করিনি; আমি যাঁকে পূজা করি তিনিই ভগবান, তিনি ছাড়া আর কোন ভগবান আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমায় যে শাস্তি হয় দাও।"

বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বল্লেন "এতদূর! ছিঃ ছিঃ, তোর মুখে কি একটুও বাধছে না? কি মেয়েই মা পেটে ধরেছিল। গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতে পারে নি? আমায় যন্ত্রণা দিতে রেখে গেছে। গোপাল, এই সর্ব্বনাশীর হাত থেকে আমায় বাঁচাও।"

ঠাকুর ঘরে গিয়ে বৃদ্ধা উপুড় হ'য়ে প'ড়ে গোপালকে আকুল হ'য়ে ডাকতে লাগলেন। এত মন দিয়ে তিনি বুঝি গোপালকে কোনদিন ডাকেন নি, নইলে গোপাল তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন কেন

শিবানী ঠাকুর ঘরে এসে স্থির হ'য়ে গোপালের মূর্ত্তির পানে

চেয়ে রইল। চোখে অজস্র বারিধারা নেবে তার মনের কালিমা বুঝি ধুয়ে যেতে লাগল। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁ লা কি দেখছিস্?"

"দেখছি গোপাল কোথায়?"

"কেন চোখের মাথা কি খেয়েছিস্?"

"না, মাসীমা এত গোপাল নয়, আমার সে-ই। হ্যাঁ, তাকে একটুও ভুল নেই, আর ত ছাড়ব না। শিবানী বিহ্বল আকুল কণ্ঠে ব'লে যেতে লাগল তুমি বলেছ গোপালের ভেতর আমাকে পাবে, কিন্তু আমি তোমার ভেতর গোপালকে পাব" বলে হঠাৎ পাগলের মত গোপালের মূর্ত্তিকে জড়িয়ে ধ'রে ঠাকুরের সিংহাসন শুদ্ধ শিবানী মাটীতে প'ড়ে গেল।

বৃদ্ধা চীৎকার করে উঠলেন, "সর্ব্বনাশ করলে, আমার ঠাকুর ছুঁয়ে দিলে, কি জ্বালায়ই পড়েছি, একি আপদ।" ইতিমধ্যে গৃহিনীর সাড়া পেয়ে ঝি দুজন উঠে এল, রাত্রিবেলা মহা হৈ হৈ,। শিবানীকে তুলতে গিয়ে দেখে নিস্পন্দ, নিঃসাড়, হিমশীতল তার দেহ।

গোপালের মূর্ত্তি অতিকষ্টে তার বুক থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল। শিবানীর মুখে কি শান্তির আভাস! সে যে ম'রে যাবে বৃদ্ধা স্বপ্নেও বুঝি ভাবতে পারেন নি। মনে বড়ই দুশ্চিন্তা হয়েছিল, না জানি এই ছুঁড়ীটাকে নিয়ে কি লাঞ্ছনাই তার অদৃষ্টে আছে। শিবানীর মুখপানে সকলেই নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। সে মুখ কি পবিত্র কি এক স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিতে শিবানীর সারাদেহ ভ'রে গেছে। কে বলে শিবানী কলঙ্কিনী।

৯

ক্রমে ভোর হয়ে এল। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। এমন সময় শশধর কোথা থেকে এসে সকলকে আরও সচকিত করে দিল। সে এই ব্যাপার দেখে মাসীমার পায়ে প'ড়ে পাগলের মত বলে উঠল, "মাসীমা, মাসীমা, এ কেমন করে হল? এ কি সত্য না স্বপ্ন? সত্যই কি আমার মহাপাপের শাস্তি আরম্ভ হল? বলুন, মাসীমা, বলুন আমি যে আজ ওকে নিয়ে যাব ব'লে এসেছি। কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম, শিবানী আমার পায়ের কাছে এসে ক্ষমা চাইছে, বলছে "তুমি ত জান, আমি কোনদিন পবিত্র লোহা, সিঁদুরের অমর্য্যাদা করিনি। যাকে ভালবেসেছি আজ তাঁর সঙ্গে চললুম, আজ দেখছি জগত জুড়ে তিনি।" শিবানী অনেক কিছু ব'লে মিলিয়ে গেল। ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে করলাম দুজনে বুঝি এবার সত্যই পালিয়েছে। নরেনদের বাড়িতে গেলাম, দেখলাম নরেন অজ্ঞান অচৈতন্যের মাঝে মাঝে শুধু প্রলাপ বকছে "শিবানী চলে যাচ্ছ?" নরেনের মা বল্লে যে নরেন নাকি ইচ্ছে করে রোদে পুড়ে, না খেয়ে এই রোগ ডেকে এনেছে। সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালাম না। সোজা এখানে চলে এসেছি।"

শশধর সত্যই আজ অনুতপ্ত। সত্যই সে অন্যায় ক'রে শিবানীকে কষ্ট দিয়েছে তা আজ বুঝতে পেরেছে, কিন্তু এখন কে তার এই প্রলাপ বাণী শুনবে? শশধর খুবই কাঁদলে, শিবানী

কি তা শুনতে পেয়েছিল ? তাঁর আত্মা কি তখনও সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? এ কথা কে ব'লে দেবে ? শশধর অনেক কেঁদে মৃতা শিবানীর পা ধ'রে ক্ষমা চাইল। অজস্র চোখের জল ফেলে সে শুধু এ কয়টী কথা ব'লে উঠে এল, শিবানী তুমি স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে গেছ, কি পাপে এই পাষণ্ডের হাতে পড়েছিলে জানি না। তুমি যার সে সত্যই ভগবান। দেখি তার কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ এ পাপীর হয় কিনা। মাসীমা, আমি নিজের হাতে সাজিয়ে শিবানীর সংকার করে আসব। আপনি সকলকে সব আয়োজন করে দিতে আদেশ করুন"। শিবানী আজ যেন সত্যই সমারোহ করে শশুর বাড়ী গেল।

বৃদ্ধা জমিদার গৃহিনীর যেন দুদিনের জন্য মনে বড় দাগ র'য়ে গেল। আহা, শিবানীকে তিনিই হত্যা করেছেন। একে স্বামীনির্য্যাতিতা তায় মাতৃশোক, তার উপর আর বাছা আমার এ লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারলে না। নিশ্চয় তার ভেতরে কিছু রোগ ধরেছিল। "ওরে শিবানী, আমি বুড়ো বয়সে একি পাপ করলাম।" আজ তিন দিন শিবানীর মৃত্যু হয়েছে। যাক্, গোপাল তাদের বংশের মুখ রেখেছেন। "তাইত বলি আমার চারুর পেটের মেয়ে। আহা কি রূপ বাছার। ওমা ওকে গো! শিবানীইত! ওমা, এত রাতে! ওরে, ও নিধুর মা. একবার শিগগীর এদিকে আয়।" নিধুর মা তখন আগাধ নিদ্রায় অভিভূত। বৃদ্ধার সারাদেহ যেন অসাড় হ'য়ে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলেন শিবানী গোপালের ঘর থেকে বেরিয়ে মোহন দীঘির ঘাটের দিকে যাচ্ছে। "ওমা ভূত নাকি ?" খানিকক্ষণ বৃদ্ধার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হল না, শুধু ভয়ে আকণ্ঠ শুকিয়ে গেল। তখন আকাশ মেঘ ক'রে আছে,

বর্ষাকাল, চারিদিকে অন্ধকার। শিবানীকে আর দেখা গেল না। বৃদ্ধা শুধু অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন। বহুক্ষণ পরে নিধুর মা পাশ ফিরতে বৃদ্ধা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে তাকে ডাকলেন, "নিধুর মা, শীগগীর ওঠ, ওঠ, শোন।"

"কেনে গো মা ঠাকরুণ? জানলা বন্ধ করে দেব, বৃষ্টি আসছে নাকি?"

"না, না, তুই উঠে একবার আলোটা জাল্ বাছা, আমার শরীরটা কেমন করছে।"

"কেনে গো, ব'লে নিধুর মা একবার চোখ রগড়ে উঠে তার মা ঠাকরুণের বিছানার কাছে এল। "ওমা, এ যে দিখি এক গা ঘেমে উঠছ। কেনে গো, ঠাণ্ডা বাতাসে এত ঘাম হল কেনে, দেখি আলোটা জালি।"

"দেখ নিধুর মা, তোদের কথা সত্যি।"

"কি কথা মা?"

"এই শিবানীর কথা।"

"চুপ, চুপ, মা, রাতের বেলা ওসব কথা করোনি। রাম। রাম। কাল রাতে আমি আর ক্ষীরি দুজনেই দেখেছি। ক্ষীরি ত আজ সেজন্যই পেটের ব্যথার ছল ক'রে বাড়ী গেল। আমিও যেতাম, কিন্তু বুড়ো মানুষটাকে একা ফেলে যাই কেমন করে। তুমি মা গয়ায় পিণ্ডি দাও। রাম, রাম! না বাপু, আমি তোমার পায়ের কাছে শুই। কাল সরকারের মাকে এখানে শুতে বলব।

বৃদ্ধা তখন কাঁদছিলেন। এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বললেন,"না না, বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি, ও কিছু নয়।" মনে মনে ভাবলেন "না এ ঠিক, সত্যিই স্বপ্ন নয় এতে কিছু ভুল নেই।" তারপর বৃদ্ধা এ বিষয় আর উত্থাপন

করলেন না। গিন্নীর খুব সাহস তা পূর্ব্বেই বলেছি। অন্য কেউ হ'লে অনেক কাণ্ড করত। কিন্তু তিনি কিছুই না ক'রে পরদিন রাতে জেগে রইলেন। দেখি, আর শিবানী আসে কিনা। এখানে তার কিসের টান, কেনই বা সে আসছে এখানে; ঠাকুরঘরে কি পূজো করতে আসে নাকি?

১০

পরদিন—গৃহিনী সেই সন্ধ্যা থেকে বিছানা নিয়েছেন। ক্রমে রাত গভীর হ'তে চলল; দু একটী নিশাচর জীব ছাড়া আর কারও সাড়া নেই, বান আসবে সকলেই বলছে। দামোদর যেন ক্রুদ্ধ গর্জ্জন করে ফুলে ফুলে উঠছে। বহুবার বান এসেছে, তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাদের বাড়ীর একতলা সমান জল উঠেছে। দোতালার এই ঘরেই আশ্রয় নিয়ে তিনি চার পাঁচ দিন থাকেন, জল কমলে তবে নীচে নামেন। আজ মেঘ করে আছে. টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃদ্ধা বাইরের দিকে চেয়ে স্থির অবিচলিত চিত্তে চুপ করে ব'সে রইলেন। জোরে একটা দমকা বাতাস এসে ঘরের জিনিষ পত্তর সব ওলট পালোট করে দিলে। খুট! সামনের জানলাটা খুলে গেল। বৃদ্ধা সচকিত হ'য়ে চেয়ে দেখলেন শিবানী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। ভয়ে

যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে কিন্তু বৃদ্ধার মনের জোর অসীম, তিনি বললেন "শিবানী, কেন তুই রোজ এখানে আসিস্?" শিবানী ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে কি যেন দেখালে। বৃদ্ধা উঁকি মেরে কিছুই দেখতে পেলেন না। কই কিছুই ত নেই। শিবানী ইসারায় জানালে যে কিছু আছে। "কি আছে" ? হাত দেখিয়ে শিবানী কি বল্লে বোঝা গেল না। মনে হ'ল যেন সে কাঁদছে। বৃদ্ধা বললেন "তুই কাঁদছিস্ কেন? তোর গয়ায় পিণ্ডি দেব, তুই এখানে আর আসিস নি।"

শিবানী ঠাকুর ঘর দেখিয়ে আবার যেন কি বল্লে, মাসীকে হাত ছানি দিয়ে ডাক্‌লে। বৃদ্ধাও মন্ত্রমুগ্ধের মত শিবানীর পশ্চাতে গেলেন। শিবানী আগে গেল, পেছনে তিনি; ভূতের পিছনে যাওয়া কম সাহসের কাজ নয়। বৃদ্ধা একবার ভাবলেন, এই বুঝি গলা টিপে দেয়, কিন্তু কথা না শুনলে হয়তো আরও বিপদের সম্ভাবনা,আর কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়েও চললেন। ক্রমে মোহনদীঘির ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। শিবানী এইবার মাটী খুঁড়ে কি যেন দেখালে। বৃদ্ধা ভাবলেন, বুঝি কাউকে পুঁতে রেখে গেছে, আমাকেও এইখানে পুঁতবে তাই দেখাচ্ছে এবার বৃদ্ধার শরীরের রক্ত হিম হ'য়ে গেল। ওরে বাবা, বুড়ো বয়সে শেষে ভূতের হাতে মরা, এই কপালে ছিল! মনে মনে তিনি গোপালকে স্মরণ করতে লাগলেন, মুখে শিবানীর দিকে চেয়ে বল্লেন "আমায় মাপ কর শিবানী।" কিন্তু শিবানী কোথায়? এতক্ষণে মাটীর দিকে চেয়ে বৃদ্ধা দেখলেন, একটু মাটী খোঁড়া। এই নিঝুম রাতে একাকী বসে মাটী খুঁড়ে বৃদ্ধা দেখেন কি তিন চারি খানা চিঠি ও একটা সোনার আংটী। এতক্ষণে সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। হায়রে, অভাগিনীর জীবনে এইটুকু

সম্বল ছিল। সে যে ক'দিন বেঁচেছিল তাই বুঝি যখন তখন ঘাটে এসে প্রাণধন আগলাত। মরেও পরম প্রিয়ের এই স্নেহের নিদর্শন ভুলতে পাচ্ছে না। বৃদ্ধা চিঠি ও আংটী হাতে ক'রে তুলে নিলেন। সেদিন থেকে শিবানীকে কেউ দেখতে পায়নি। চিঠিগুলো কিছুই পড়া যায়নি কাদায় জলে সব ধুয়ে গিছল। আংটী দিয়ে নাকি গোপালের পায়ের নুপুর তৈরী করান হয়েছিলো। বৃদ্ধার ধারণা শিবানী নাকি সেই ইঙ্গিত করে গেছে।

অলকা

১

গরমের ছুটির সময় দেবব্রত গাঙ্গুলী স্ত্রী পুত্র কন্যা ও ভৃত্যসহ এলেন কাশীতে বেড়াতে। বিশ্বনাথ মন্দিরের পেছনের গলিতে একখানি দোতলা বাড়ী ভাড়া নিলেন। লোকটিকে দেখলেই যেন মনে শ্রদ্ধার ভাব আপনা হতেই আসে, মনে হয় যেন গেরুয়া পরলেই এঁকে মানায় ভাল। বয়েস চল্লিশের মধ্যে, এক কথায় সুপুরুষ বলা চলে। স্ত্রী বিজনবাসিনীও দেখতে মন্দ নয় বয়েস ঐ তিরিশের কাছাকাছি। ছেলেমেয়ে মাত্র দুটি, অরুণ আর ছবি। নূতন জায়গায় এসে ঘর কন্যার ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত—বেড়াতে যাওয়া আর ঘটে উঠছেনা, সেদিন বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তেই—আকাশ বাদ সাধলে, দুপুর থেকে ঘনঘটা করে বাদল নামল। বৃষ্টির বিরাম নেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত হল, বাড়ীর সকলেই ক্লান্ত হয়ে শুতে গেল। দেবব্রত দোতলার একখানি ঘরে চেয়ারে বসে আকাশ পাতাল কত কি ভাবে—এতদিন পরে কাশীতে কেন আসা হল, আর কি বেড়াবার জায়গা ছিলনা, কাশীতে আসা অবধি মন যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে—সেই পুরাতন

স্মৃতিগুলো যেন মনে পড়ে যাচ্ছে, বুঝি কাশীতে না এলেই ভাল ছিল। মনে-হয় কাশীতে কে যেন জোর করেই টেনে এনেছে।

চিন্তার সূত্র কেটে দিয়ে ঘড়ি ঢং ঢং করে বেজে জানিয়ে দিল—রাত দশটা। নাঃ শোওয়া যাক, আনমনে 'বলেই দেবব্রত ভৃত্যকে ডাক দিলে—

"ওরে—ও ফাগুয়া সদরদরজা বন্ধ করেছিস?" নীচে থেকে ভৃত্য উত্তর দিলে—

"আজ্ঞে বন্ধ করবার লাগিত যাইছিলাম—কিন্তু এই মাঠাকরুণের লাগি।"

"মাঠাকরুণ? মাঠাকরুণ ত অনেকক্ষণ শুতে গেছেন রে" বলেই দেবব্রত ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে পুনরায় বললে কেন কিছু দরকার আছে নাকি? ভৃত্য ব্যস্ত হয়ে বললে, "আজ্ঞে না, না, আপনি একটিবার নামিয়া আসেন, এক ভদ্রলোকের মেয়ে আসছেন, বলছেন তেনার ভারী দরকার।"

"এত রাতে কেরে? কি বললি ভদ্রলোকের মেয়ে? আচ্ছা যাচ্ছি" বলেই দেবব্রত চিন্তিত মনে নীচে নেমে আসে। দেখে···এক রমণী···আগাগোড়া তার দেহ চাদরে আবৃত মুখখানা ভাল করে দেখা যায় না—বাইরে তখন গভীর অন্ধকার, হয়ত দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি তখনও পড়ছিল, দেবব্রত ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললে "ওকি বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? ভেতরে আসুন।"

মেয়েটি চকিত ত্রস্ত হয়ে এদিক 'ওদিক চেয়ে মাথার কাপড়

আরো একটু টেনে এগিয়ে এসে নিম্নস্বরে বললে "—আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি—আপনি যদি দয়া করে—"

দেবব্রত আশ্চর্য্য হয়ে বললে "বিপদ? কি হয়েছে? এত রাতে একলা এসেছেন—থাকেন কোথায়?"

"বেশী দূরে নয়—আপনার বাড়ী থেকে দশমিনিটের পথ ঐ যে মোড়ের মাথায় ঐ বড় লাল বাড়ীটা।"

আচ্ছা, আপনি হাঁফাচ্ছেন দেখছি, এই চেয়ারে বসুন—কি ব্যাপার হয়েছে আমায় একটু না বললে ত আমি কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা।"

দুজনেই চেয়ার টেনে বসে—মেয়েটি যেন লজ্জিত হয় ইতস্ততঃ করে। দেবব্রত ভাবে তাইত নিশুতি রাতে এ মেয়েটি কে? একান্ত আপনার ভেবে দেবব্রতকে তার বিপদে সাহায্য করবার জন্য ডাকতে এসেছে, এত বড় সহরটায় আর লোক মিলল না? একবার পার্শ্বস্থিতা রমনীর পানে চোখ ফেরালে—একি এই মেয়েটিকে যে সেদিন দেবব্রত বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতির সময় দেখেছে—হ্যাঁ—তাইত দেবব্রত যেন এই মেয়েটিকে দেখে হঠাৎ ভারী চমকে উঠেছিল এই মেয়েটি সেই আরতির মাঝে—কি—অপলক বিহ্বল দৃষ্টিতে দেবব্রতর পানে চেয়ে ছিল, সে দৃষ্টিতে দেবব্রতর মনে কি ভীষণ আলোড়ন সুরু হয়ে গিছল, দেবব্রতও চোখ ফেরাতে পারিনি। পরক্ষণেই দেবব্রত সংযত হয়ে পড়েছিল, তাইত পরস্ত্রীর পানে এমন করে চাওয়া ভারী অনুচিত—মেয়েটি সধবা। তারপর আরতি শেষে যখন দেবব্রত মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছে হঠাৎ মেয়েটি—এসে তাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলে—

সঙ্গে সঙ্গে তার আঁচল থেকে কতকগুলি ফুল ঝরে পড়ল দেবব্রতর পায়ের উপর—দেবতার প্রাপ্য ফুল কিনা দেবব্রতর পায়ে? দেবব্রতর নিজেকেই ভারী অপরাধী মনে করেছিল কিন্তু পরক্ষণেই এই সুন্দরী অপরিচিতা মেয়েটির উপর এক গভীর—করুণার উদ্রেক হয়েছিল, মনে হল ভিখারিণী কাশীতে এমন কত থাকে। দেখে মনে হয় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আহা হয়ত অবস্থা বিপর্য্যায় পড়ে বেচারী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে, অদৃষ্ট চক্র মানুষকে কোথা থেকে কোথা নিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে কিছু টাকা দিতে গিয়ে দেবব্রত কি অপ্রস্তুতেই না পড়েছিল মেয়েটি টাকা দেখে ম্লান হেসে বলেছিল "টাকা আমার চাই না, শুধু আপনি কোথায় থাকেন বলুন, নাম ঠিকানা আমি জানতে চাই।" নাম ঠিকানা দেবব্রত দিয়েছিল বটে। কিন্তু আজ সেই নাম ঠিকানা জেনে কি উদ্দেশ্যে এ এসেছে? মাত্র ঐ টুকু আলাপে কোন ভদ্রমহিলা এতরাতে সম্পূর্ণ অজানা লোকের কাছে নিঃসঙ্কোচে আসতে পারে? মেয়েটি দেবব্রতকে তার দিকে বারে বারে আশ্চর্য্য হয়ে চাইতে দেখে, এবার ব্যাকুল হয়ে মুখতুলে বল্লে, "দেখুন এইরাতে অসময়ে এসে আপনাকে ভারী কষ্ট দিচ্ছি কিছু মনে করবেন না। আমার কেউ যদি থাকত তবে কি আমি এমন করে"—মেয়েটি যেন আর বলতে পারেনা আকাশের ঐ আসন্ন বৃষ্টির মতই তার চোখে জল ভরে আসে—তবু সংযত হয়ে সে বলে—"সাধ করে কেউ কি কারুকে কষ্ট দেয়?" দেবব্রত এবার সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলে "না মনে কিছু করছি না, তবে, আপনার বিপদটা কি খুলে না বললে—আর আপনার বাড়ীতে কি আর

কেউ নেই? "আপনাকে দেখেত মনে হচ্ছে আপনার স্বামী জীবিত।"

"হ্যাঁ, আমার স্বামীরই বড় ব্যামো, আজ রাতের মধ্যে তাঁর কাছে না গেলে হয়ত আমার—আর তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হবেনা।"

"তবে এখন—আমায় কি করতে হবে এবার বলুন।" মেয়েটি দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেও, এবার সে স্থির হয়ে সব বলবার জন্য দেবব্রতরদিকে ফিরে বসল। দেবব্রত তাকে ভাল করে এইবার দেখতে পেয়ে ভারী বিমনা হয়ে পড়ল তাইত সেই মুখ—সেই চোখ সেই কোঁকড়া চুলের মাঝে ঐ ফুলের মত মুখ এ যেন সেই—"দেবব্রতকে পুনরায় এভাবে চাইতে দেখে মেয়েটি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলে যেতে লাগল "শুনুন প্রথমেই বলে রাখি আমার জীবনের কাহিনী, খুব সংক্ষেপে বললেও আপনার কাছে এক রহস্যময় ভূতের গল্প মনে হবে। আমি এসেছি আপনাকে সবকথা বলতে, অরি সব শুনে যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে চান এই আশায়, যাহ'ক—উপস্থিত আমার স্বামী মৃত্যুশয্যায়, তাঁর বড় বড় ছেলে বৌ সবই আছে—কিন্তু—" এরা সব আমার সতীন ছেলে, আমি আমার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আমার স্বামী আমায় বাড়ী টাকা উইল করে দেওয়ার জন্য ছেলেরা সকলেই শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার স্বামীকে নিয়ে ক'মাস যমে মানুষে টানাটানি চলছে কদিন আগে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান—সেই সুযোগে বাড়ীর সকলে মিলে তাঁর ঘরে আমায় যেতে দিচ্ছেনা। শুধু বাড়ীর ঝি—চাকরের জন্য এখনও আমি ও বাড়ীতে কোন রকমে

আছি। তারা আমায় মায়ের মত শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ওরা আমার স্বামীকে দিয়ে কোন রকমে উইল বদলাবার জন্য কত কি ফন্দি আঁটছে। আমি বাড়ী টাকা কিছুই চাইনা আমার মন ভারী উতলা হচ্ছে—ওঁকে যদি মেরে ফেলে আমি কোথা যাব। আমার স্বামী যে বড় ভাল তাঁর যত্নে দয়ায় আমি সকল দুঃখ এতদিন ভুলে ছিলাম। আপনি যদি একবার আমার সঙ্গে গিয়ে বলেন, যে আপনি আমার আপনারজন তাহলে ছেলেরা বেশী কিছু করতে সাহস করবে না।" দেবব্রত সশঙ্কিত হয়ে বলে উঠল—সে কি করে সম্ভব বলুন, আমি আপনাকে চিনিনা—আপনিও আমাকে চেনেন না এস্থলে—আমি মধ্যস্থ হয়ে গিয়ে দাঁড়ালে—আপনার বিপদ আরো—বাড়বে—বই কমবে না। তার চেয়ে আপনার বাপের বাড়ীর কোন আত্মীয় যদি থাকেন।" মেয়েটি এবার দৃঢ়কণ্ঠে বললে "না না,—আপনি আমায় না চিনলেও—আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি না গেলে আমার উপায় নেই। আমার জগতে আর কেউ নেই যে।"

দেবব্রতর মাথা ঘুরতে থাকে তাইত এ বলে কি? পাগল নয়ত? আর ঐ লাল বড় বাড়ীটায় নিশ্চয় কোন ধনী লোকই থাকে। কারণ প্রথম দিন বিশ্বনাথের মন্দিরে যেতেই বাড়ীটা চোখে পড়েছিল। মেয়েটি সেই বাড়ীরই গৃহিনী। এ যেন—অদ্ভুত নাটকের এক অঙ্ক। মেয়েটি দেবব্রতকে ইতস্তত করতে দেখে বলে "আচ্ছা তবে আমার আগের জীবনের ইতিহাসটী খানিক শুনুন তবেই আমার এখানে আসাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।" মেয়েটি আবার বলে—"জ্ঞান হওয়া অবধি দেখতাম, বাড়ীতে শুধু মা—আর—আমি, আর একটি মাত্র ঝি।

গঙ্গা থেকে খানিকটা দূরে আমাদের ছোট কুঁড়ে ঘরখানা ছিল। মা সর্ব্বদা পূজা—অর্চ্চনা নিয়ে থাকতেন। মা আমায়—কোথায় যেতে দিতেন না—সর্ব্বদা—আমাকে আগলে রাখতেন, খুব ছোট বেলা হ'তে আমিও বিশ্বনাথের পূজারিণী হয়েছিলাম কিন্তু সেই বয়সে বিশ্বনাথকে উপলব্ধি করবার মত জ্ঞান আমার হয়নি। তবু মায়ের দেখাদেখি পূজা করতাম। তারপর ৭।৮ বছর বয়সে মা দিলেন স্কুলে ভর্ত্তি করে। পাঁচটা মেয়ে পেয়ে ভারী এবার আনন্দে দিনকাটতে লাগলো পড়াশোনাও বেশ ভালই করতাম। বয়েস আমার বেড়েই চলল—ক্রমে কৈশোর থেকে যৌবনে পড়লাম। মাকে এবার ভারী চিন্তিত দেখলাম, প্রায়ই আমায় বলতে লাগলেন "মা আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, আমি মরে গেলে তোকে রামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকতে হবে মা।" আমি কত কি ভাবতাম, তাইত কত মেয়েদের, বাপ, কাকা, মামা, মাসী, পিসী থাকে—কই আমি ত কারুর কথাই শুনিনা। একদিন মাকে বললাম—"হাঁ মা আমাদের কি আর কেউ নেই?" সেদিন মাকে প্রথম বলতে শুনলাম "ওরে, হতভাগী, বিশ্বনাথ ছাড়া আর তোর কেউ নাই। বিশ্বনাথ যখন তোকে আমার কোলে এনে দিয়েছেন, আমিও তেমনি বিশ্বনাথের পায়েই তোকে দিয়ে যাব। মা প্রায়ই আমায় নানা উপদেশ দিতেন। বাড়ীতে ঠাকুর ছিল আমার ও মনে বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিলো যে বিশ্বনাথ পাথর হলেও—কথা না কইলেও তিনিই আমার একমাত্র আপন—তবে পূজা করতাম আর মনে হত বিশ্বনাথ কেন কথা কন না। কত কেঁদে বলতাম—"মা মরে গেলে তুমি আর আমি—তুমি কি এমনি নীরবই থাকবে?" হঠাৎ একদিন মা আমায় স্কুল ছাড়িয়ে

দিলেন। শুনলাম আমার বিয়ে ঐ বিখ্যাত ধনী 'চক্রবর্ত্তী মশায়ের' সঙ্গে —বৃদ্ধ নাকি আমায় দেখে বিয়ে করতে চেয়েছেন। আমার সারা মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, কেন বুড়ো ছাড়া আর বর মিলল না মাকে গিয়ে বললাম—"হ্যাঁ মা—এই যে তুমি বল আমায় আশ্রমে দেবে আমার বিশ্বনাথ ছাড়া কেউ নেই – তবে ঐ বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ কেন। মা বলেছিলেন যদিও সে কথা আজও বুঝিনি, বলেছিলেন "মা তুমি এত বড় মেয়ে হয়েছো একটু বুঝতে শেখ—পুরুষের লালসার হাত থেকে বাঁচতে হলে স্ত্রালোকের স্বামীর অশ্রায় চাই। এ সুযোগ বিশ্বনাথই করে দিয়েছেন নইলে তোমার যে বিয়ে হবে তা স্বপ্নে ভাবিনী স্বামীকে বিশ্বনাথ জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি পূজো করো মা—গীতায় আছে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'নারদ দেব প্রতিমায় প্রতিষ্ঠামন্ত্রে আমি আবির্ভূত হই, কিন্তু মানব দেহ প্রতিমায় আমি অনুক্ষণ বিরাজিত' আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতাম না। মা মনের ভাব বুঝে বলতেন "মা স্বামীকে বিশ্বনাথ মনে করে পূজা করো একদিন স্বয়ং বিশ্বনাথ তোমায় দেখা দেবেন। একদিন তুমি বিশ্বনাথের কৃপা পাবে। যতদিন তাঁকে উপলব্ধি না কর ততদিন সংসারে থেকে হিন্দু মেয়ের ধর্ম্ম পালন করে যেও।"

তারপর আমার বিয়ে হয়ে গেল কিছুদিন পরে মা নিশ্চিন্তে বিশ্বনাথের নাম করতে করতে, মারা গেলেন। আমার কিন্তু বিয়ে হবার সঙ্গে—সঙ্গেই মনে হত যেন এ আমার ঘর নয়—যেন স্বপ্নে দেখার মত আমার সব স্বামী ঘর কন্না—শ্বাশুড়ী সব কোন জন্মে কারা ছিল। কেন এমনটা হয় বুঝতাম না।" বলতে বলতে মেয়েটি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল —কিসের মোহ কিসের স্মৃতি যেন তাকে দিল উন্মনা করে। দেবব্রত ব্যস্ত

হয়, বললে—"আপনার কথা শেষ করুন, রাত যে অনেক হল" মেয়েটি আবার বললে, "স্বামী বৃদ্ধ হলেও, তাঁর উদার হৃদয়—মহৎ চরিত্র দয়া দেখে আমি তাঁকে সত্যই মনে মনে পূজা করতাম। তিনি প্রায় বলতেন আমি তোমায় বিয়ে করে ভারী অন্যায় করেছি তোমার জীবনটাও বার্থ হল আর বাড়ীতেও অশান্তির আগুন জ্বলে উঠলো। শ্বশুর বাড়ীতে সত্যই আমায় নিয়ে অশান্তি—তাদের রাতদিন বলতে শুনতাম 'কোথা থেকে বুড়বয়সে এক কুড়োনা মেয়ে বিয়ে করে বসল, ভীমরতি আর কাকে বলে, এখন পাপ বিদেয় কি করে করা যায়। আমার স্বামী কেও দেখতাম তিনি ইদানী সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকতেন। কিন্তু তিনি বাড়ীর মালিক—আমাকে তাড়াতে কেউ সাহস করেনি। তিনি আমার সমস্ত পূজার আয়োজন করে দিয়ে বললেন তুমি ওসবে কান দিয়ো না পূজা অর্চ্চনা নিয়ে থাক, আমি তোমার একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে মরব না কিন্তু অদৃষ্ট! ক্রমে সত্যই একদিন স্বামী অসুখে পড়লেন—আমায় ওরা তখন জোর করে সরিয়ে দিলে, ঝি চাকরের সহায়তায় আমি দিনান্তে এক একবার স্বামীর বিছানার কাছে যেতে পারতাম কিন্তু সেদিন তাঁর যখন বড়—অসুখ বাড়াবাড়ি, আমি আহার নিদ্রা ভুলে শুধু এক মনে এবার বিশ্বনাথকে ডাকতে লাগলাম ওগো. বিশ্বনাথ, এবার আমি কোথা যাব! বলে দাও আমার জগতে কে আপন আছে, আমি কার কাছে যাব, বড় কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন ছাতের উপর ঘুমিয়ে পড়েছি। দেখলাম কি বিশ্বনাথ এসেছেন, বলছেন, উঠ—আর কেঁদোনা এবার তোমার আপন জনের দেখা পাবে। মনে হল কার কোলে মাথা রেখে যেন শুয়ে আছি। কত জন্ম জন্মান্তর ঐ কোলে মাথা

রেখে শুয়েছি কিন্তু তাঁর মুখ দেখতে পেলাম না শুধু শুনলাম তিনি বলছেন "কাল আরতির সময় বিশ্বনাথের মন্দিরে যেও তোমার আপনজনের দেখা পাবে—তুমি তাঁকে দেখেই চিনতে পারবে।" মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বললে—"কাল সেইজন্যেই আপনাকে মন্দিরে চিনেছিলাম আজ সেইজন্যেই ছুটে এসেছি।" মেয়েটির মুখে এক অপূর্ব জ্যোতি ফুটে উঠে। দেবব্রত ভাবে কি আশ্চর্য্য মেয়েরা এত ভাববিহ্বল হয় এই স্বপ্ন দেখে সে এতটা এগিয়েছে—এও কি সম্ভব—কিন্তু এই ব্যাগাতুরা নারীর অনুরোধ উপেক্ষা করাও যে যায় না। কিন্তু এতটা যখন এগিয়েছে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাক। দেবব্রত মুখে বললে—"আচ্ছা কাল আমি সকালে আপনার বাড়ী যাব—কিন্তু একটু ভেবে দেখবার বিষয় আছে—তাঁরাই বা কি মনে করবেন আপনার স্বপ্নের উপর নির্ভর করে ত কেউ বিশ্বাস করবেনা···তাছাড়া···আমিই বা···কে" মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠে "আপনাকে এর বিহিত করতেই হবে এ বিশ্বনাথের আদেশ এখন আমার···সঙ্গে চলুন বাড়ীটা—দেখে আসবেন, সেই সঙ্গে আমার ঝি চাকরদের বলে রাখব কাল সকালে আপনার যাওয়া চাই। যদি রাত্তেই আমার স্বামীর কিছু হয়—তবে ওরা আমায় মেরে ফেলতেও পারে। এখন উঠুন আমার ঝি বাইরে হয়ত এখনও দাঁড়িয়ে আছে।"

দেবব্রত নিঃশব্দে এবার মেয়েটীর অনুসরণ করে। রাস্তায় এসে মনে হয়—এমন গল্পে কত পড়া যায়—একটি মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়েছে আরো কত কি। সৎ উদ্দেশ্যে যে বেরিয়েছে, বিপদের দিকে লক্ষ্য নেই, মনে কোন কু অভিপ্রায় নেই, কিন্তু মনে

পড়ে না। জীবনে এমন সাহস বা দুঃসাহসের কখনও সুযোগ হয়েছে কিনা।

গুর গুর করে মেঘ ডেকে উঠল—বিদ্যুৎ চমকাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পা চালিয়ে দিলে। দেবব্রত যেন কি এক মোহময় আবেষ্টনের মধ্যে এসে পড়েছে আবার সেই অতীতের স্মৃতি তার মনে তোলপাড় করে—এবং প্রত্যেক কথার ভঙ্গিতে যেন দেবব্রত অভিভূত হয়ে পড়ে—কে এ অমরাসনা পথ ভুলে তার হৃদয়ের বাতায়ন তলে এসে দাঁড়াল। মন যেন বলে কি এক অভিশাপে এর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। এ যেন আমার সেই হারান অলকা।

বাড়ীর সম্মুখে তারা এসে দাঁড়ায়। বাগানের ফুলের গন্ধে চারিদিক ভরপুর—মেয়েটি—প্রণাম করে বললে এই বাড়ী—দেখলেন ত—সকালে আসবেন। পারেন ত আমার মার পুরাতন ঝিকে সঙ্গে—নিয়ে আসবেন তার নাম 'ক্ষীরি' ঠিকানা ৭ নম্বর—বাঙ্গালীটোলা। তাকে বলবেন—অলকা—তোমায় ডেকেছে।"

মেয়েটি ঝিএর সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে। দেবব্রত চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল—"অলকা—অলকা—দাঁড়ান—দাঁড়ান।" কিন্তু···কারও আর সাড়া নেই। অগত্যা—দেবব্রত উন্মনা হয়ে ধীরে ধীরে এসে পড়ল গঙ্গারধারে। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল তাইত তাকে যে বাড়ীতে ফিরতে হবে।

দূর থেকে একটা গানের ক'লাইন তার কানে এলো এক ভাব মুগ্ধ মাঝি রাতের নীরবতা ভঙ্গ ক'রে গাইছে।

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি যে আর
বাইতে পারলাম না।
বাইতে বাইতে জনম গেল
তবু আমার.......... .. ..."

অনেক রাতে দেবব্রত বাড়ী ফিরে দেখলে ঝি চাকর এমন কি বিজন বাসিনী পর্যন্ত তার জন্ম অপেক্ষা করছে। ঝি চাকরের দেখা অভ্যাস আছে যে তাদের মনিব প্রায়ই পরোপকার করতে গিয়ে আহার নিদ্রার সময় থাকেনা। কাজেই তারা বিনা বাক্যব্যয়ে যে যার শুতে চলে গেল, কিন্তু বিজনবাসিনীর মুখ তখন ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরনীর মত। দেখলে স্বামী বেশ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে শোবার ব্যবস্থা করছে কাজেই আর চুপ করে থাকতে পারলেনা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল।—

"বলি দেশে থাকতে ত পরোপকারের ঘটায় প্রাণ ঝালাপালা, ওমা বিদেশে বেড়াতে এল কোথায় স্থিতি হয়ে সময়ে খাবে ঘুমোবে তা নয়। কি জ্বালায় পড়লাম আবার, জোটালেই জোটে তা নইলে, এত রাতে সহরে আর লোক পেলেনা, ডাকতে এল কিনা তোমাকে ও মাগী কে শীগ্‌গীর বল ? কাগুয়া বলে "ভদ্রলোকের মেয়ে"। এত রাতে ভদ্রলোকের মেয়ে বসে আছে, শরীর জ্বলে যায়। চুপ করে আছ যে ও কে বলনা ? কি হয়েছিল তার ?" দেবব্রত এতক্ষনে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে।—

"বিজু কেন মিছে রেগে যাচ্ছো, মেয়েটির সত্যই ভারী বিপদ, আজ অনেক রাত হয়েছে কাল তখন বলব। বিপদে মানুষকে সাহায্য করলে কি জ্বালা হয়, বিপদ কি সময় বুঝে লোক বুঝে আসে ! মনে করনা

তুমিই যদি এই বিদেশে বিভুঁয়ে একটা কিছু বিপদে পড়। এই ধর আমায় যদি পুলিশে নিয়ে যায় তখন তুমি পাগলের মত কাউকে...

বিজনবাসিনী বাধা দিয়ে বলে উঠল। "কথার ছিরি দেখ কি কথায় কি কথা আনলে কেন আমার স্বামীকি চোর না ডাকাত? যে পুলিশে নিয়ে যাবে। আমার মত স্বামী কজনের ভাগ্যে হয় তবে আমায় দেখতে পারেনা এই যা দুঃখ। তা হ্যাঁ গা ওই মেয়ে মানুষটার স্বামীকে বুঝি পুলিশে নিয়ে গেছে! ও হরিবোল, তা কি হল?" দেবব্রত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে

"সে তখন কাল হবে। আজ অনেক রাত হল যে শোবেনা?" বিজনবাসিনী। রেগে গিয়ে বললে,

"রাতটা কি আমার দোষে? সে যাহক কাল সকালে কিন্তু আমরা বেড়াতে বেরোব।"

"কাল সকালে আমার যাওয়া হবেনা"

"কেন শুনি?"

"বিশেষ দরকার আছে।"

"কি দরকার?"

"সেই মেয়েটির খোঁজ নিতে হবে"

"এখানে এসে দেখছি পরোপকারের ঘটাটা বাড়ল, তা হবেইত তা আচ্ছা এখানে এসে তোমার সেই অলকার কথা মনে পড়ছে না? দেবব্রত চমকে উঠল! সত্যই, সাধ্বী স্ত্রীর অজানা বুঝি কিছু নেই! সে আমতা আমতা করে বললে।

"তা পড়েছে বই কি'

বিজন এইবার কৌতুকহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিয়ে বললে' —

"এমন নইলে প্রেম : কোন কালে ছয় বছরের বৌ জলে ডুবে মরে গেছে, তার কথা এখনও ভাবছ, তা—স্থানমাহাত্ম আছেত' —

"সত্যি করে বলত তোমার এখনও তাকে মনে পড়ে ?"

"আঃ বিজু ঘুমাতে দাও, ভারী ঘুম এসেছে।"

"আমার সঙ্গে কথা বলতে হলেই যত ঘুম আসে না ? কেন অলকার সঙ্গেত স্কুল কামাই করে খেলা করতে। মা বলতেন দু'জনে একদণ্ড ছাড়াছাড়ি থাকত না।"

দেবব্রত পাশ ফিরে শুয়ে বললে,

"তখন ছেলেমানুষের কথা ছেড়ে দাও মায়ের কাছে তুমি বুঝি ঐসব শুনতে ?"

"হ্যাঁ গো মশাই তোমার সব খবরই জানা আছে "

"তবে আর কি এইবার ঘুমাতে দাও।"

কিন্তু দেবব্রতর ঘুম হ'লনা। সারারাত তন্দ্রার মাঝে সেই একখানি ছোট সুন্দর মুখ মানস চক্ষে উঁকি ঝুকি মারে হ্যাঁ ঠিক সেই চোখ, সেই নাক সেই মুখ সেই চুল সবইত সেই রকম। আজ মা বেঁচে থাকলে ঠিক চিনতেন। যদি সত্যিই অলকা হয়, তবে তবে ? কিন্তু তবুও সে যে পরস্ত্রী উঃ একি অদ্ভুত সংঘটন নাঃ—ছিঃ—এসব ভাবতে নেই। কেন আমি তাকে ভাবি দুদিনের জন্য সে কেন আমায় এমন করে দাগা দিয়ে গেল। না সে মরে গেছে। এটুকু শুধু আমার মনের দুর্ব্বলতা, হয়ত কাশীতে এসে অলকার কথা ভেবেছি সেইজন্যই আজ কল্পনায় অভিভূত করে ফেলেছে। নাঃ একথা আর ভাবব না,

কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ অবধি কত মেয়েকেত দেখলাম দেখেছি কিন্তু একে দেখেই বা কেন, আমার অলকাকে মনে পড়ে যায়? আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানে কিছু অধর্ম্ম করিনি। ভগবান আমায় শুধু জানতে দাও এ—কে—? যদি অলকা হয় যদি সত্যই তাই হয়? না—আবার সেই চিন্তা, এমনি করে দেবব্রত সমস্তরাত ঘুমাতে পারলেনা।

২

এই বিচিত্রময় জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। নিয়তির ঘুর্ণিয়মান আবর্ত্তনে মানুষকে যে কোথা হতে কোথায় নিয়ে যায় কেউ কল্পনায়ও আনতে সমর্থ হয় না।

দেবব্রত ও অলকার জীবনও এমনি রহস্যময় একটা ভারী অদ্ভুত ও বেদনাময় কাহিণী।

সে আজ অনেক দিনের কথা বাঙ্গালাদেশের কোন এক নিভৃত পল্লীতে হরনাথগাঙ্গুলী বাস করতেন। তাঁর পোষ্য মাত্র তাঁর স্ত্রী উমাশশী ও একমাত্র পুত্র দেবব্রত। কোন সওদাগরী অফিসে মোটা মাহিনার চাকরী করতেন, তাছাড়া বিষয় আশয় নেহাৎ মন্দ ছিলনা। বড় শান্তির সংসার ছিল তাঁদের। পুত্র দেবব্রত পিতা-

মাতার অজস্র স্নেহের অধিকারী হয়েও চরিত্রগুণে, স্বভাবমাধুর্য্যে গ্রামের সেরা ছেলে বলে গণ্য ছিল। এই সুদর্শন বালকটীর বয়স যখন মাত্র পনেরো বৎসর তখন অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই হঠাৎ হরনাথবাবু সন্ন্যাস রোগে স্ত্রী পুত্রের মায়া কাটিয়ে কোন রহস্য লোকে চলে গেলেন। তাঁর বড় সাধের সংসার তাঁর অভাবে শ্মশানে পরিণত হতে চলল। উমাশশী স্বামীকে চিরদিনের মত শেষ দেখা দেখে সেই যে ভূমিশয্যা নিয়েছেন আর উঠেন নি। আত্মীয় স্বজনের সান্ত্বনাবাণী তাঁর কানে প্রবেশ করেছিল কিনা কে জানে। আজ তাঁর মনে হচ্ছে যে সংসারের সকল কাজ শেষ হয়ে গেছে সমগ্র অন্তররাজ্যে একি বিপুল শূন্যতা সকল ইন্দ্রিয়গুলি যেন আজ বিকল হ'য়ে গেছে। কার অলক্ষ্য অমোঘ দণ্ড আজ তাঁর বড় সাধের সংসারকে বড় আনন্দময় জীবনকে চুরমার করে দিয়ে সমস্ত কর্ম্মশক্তিকে যেন জন্মের মত নিশ্চল করে দিয়েছে। কিন্তু সংসার সে কথা শুনলেনা আপনার জন সবাই উমাশশীকে বার বার মনে করিয়ে দিলে যে দেবব্রত আজ কদিন কিছু খাচ্ছে না. তার মুখ চাইলে বুক ফেটে যায়। তুমি মা—উঠ, ছেলের মুখ দেখে বুক বাঁধ তোমার চেয়ে আজ সে কিছু কম কাতর হয়নি। এই ভরসন্ধ্যাবেলা মাঠের মাঝে পাগলের মত বসে আছে কেউ তাকে খাওয়ালে খাচ্ছে নচেৎ দিনরাত—উন্মনা হয়ে শুধু কি ভাবে।—এ কথা মিথ্যা নয়। দেবব্রত এ বয়সেই বড় ভাবুক হয়ে পড়েছে। তার উপর হঠাৎ পিতার মৃত্যুতে সে যেন আজ পৃথিবীর অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে। সে শুধু ভাবে দুদিন আগে এই

শান্ত শীতল সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবী তার কি ভালই লাগত। বাবার সঙ্গে যখন চাঁদের আলোতে এই মাঠে বেড়াতাম তখন মনে হত স্বর্গ আবার কোথায়? এই ত স্বর্গ। এর চেয়ে মধুময় জীবন আর কি আছে? কিন্তু বাবা কোথায় গেলেন? সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী এমন জমাট অন্ধকারে ভরে গেল কেন?·ছুটে মায়ের কাছে যায়, মায়েরও দিকে চাওয়া যায় না, মনে হয় বাবা মা দুইই চলে গেছেন। শুয়ে আছেন ও কে? মা? না মায়ের ছায়া? আচ্ছা মাও যদি মরে যায় তবে আমি কি করব? কেন যদি বেঁচে থাকি তবে যত টাকা কড়ি আছে সব স্বদেশের জন্য দান করব আর এই দেশেতেই থেকে ডাক্তারী পড়ে যত অনাথ আতুর আছে তাদের একটা হাঁসপাতাল করব আর সারাদিন কাজকর্ম্ম সেরে বাবা মার ছবিকে পূজো করব। বাবা মা মনে হতেই দেবব্রত পাগলের মত কাঁদতে বসে, এমন সময় উমাশশী দেবব্রতকে বুকে করে ঘরে নিয়ে গেলেন। বড় দুঃখে মানুষ কাঁদে, শোকে ভেঙ্গে পড়ে—কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষেরেও পরিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তে, যেমনটি ছিল, তেমনটি না হলেও আবার মানুষ মন বেঁধে ঘরকন্না করে। সংসারে সং সাজতেই হয়। উমাশশী আবার মনের জোর করে উঠলেন। পুত্র দেবব্রত ও পিতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপন করলে। আত্মীয় স্বজনও ক্রমে যে যার ঘরে ফিরে গেল, দিন কারও মুখ চায়না, দিন কাটে, বড় দুঃখে শোকে মাতা পুত্রের চোখের জলে দিন অতিবাহিত হয় কিন্তু দেবব্রত'র উদাসীন ভাব এক সময় সকলেরই চোখে পড়ল। উমাশশী পুত্রের মনোভাব বুঝে স্বামী শোককে অন্তঃমুখী করে বাহিরে কর্ম্মে দ্বিগুণ প্রেরনা নিয়ে এলেন, নইলে বুঝি সব যায়। দেবব্রতর মত কত ছেলে ত পিতৃহীন হয় কিন্তু এমন

উদাসীন এ বয়সে কে হয়? সে যেন কমাসের মধ্যেই এই কৈশোরেই অতিরিক্ত গম্ভীর ও সংযত হয়ে উঠেছে। বালসুলভচাপল্য আর তার মধ্যে নেই, ধর্ম্মপুস্তক পড়তে পেলে আর কিছুই চায়না। সকল কাজে সকল কথায় তার জীবের প্রতি করুনা ঝরে পড়ে। সংসারী লোকের দৃষ্টিতে এ সবই যেন সকলের বড় অশোভন ঠেক্‌ল। সকলেই দেবব্রতর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল। ছেলে বুঝি "চৈতন্যদেবের" মত সন্ন্যাস নেবে। এইসব আলোচনার ভেতর দেবব্রত মাকে একদিন বলে বসল "মা আমার জন্য তুমি কেন মাছ মাংসের হাঙ্গামা কর আমি আজ থেকে এসব ছেড়ে দিলাম।"

মা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন।

"ও কথা বলোনা বাবা মাছ নইলে তোমার এক গাল ভাত উঠেনা কেন এ সব মতলব তোমায় কে দিলে?"

দেবব্রত ম্লান হেসে মাকে বললে।

"আচ্ছা মা তুমি দেখে নিও, আমি বিনা মাছে কতটা ভাত খাব আর আমার শরীরও এত ভাল থাকবে, মুনিঋষিরা শুধু গাছের ফল খেয়ে কতদিন বাঁচতেন। তাঁদের কোন রোগ হত না আর মাছ না খেলেই মরে যাব! কেন এত ভালই হবে মা, তুমি আমি এক হাঁড়িতে খাব।" মায়ের কোন আপত্তি টিকলনা, দেবব্রত মাছ মাংস ইত্যাদি ত্যাগ করলে।

এইবার সকলে একবাক্যে উমাশশীকে বলতে লাগল না: এ ছেলে কখনই ঘরে থাকবে না। এর যা হয় একটা বিলি করতে হবে। পাঁচজন আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশী শুভার্থীরা উমাশশীকে ছেলের মন যাতে সংসারী হয় সেই ব্যবস্থা করতে উপদেশ দিলেন।

ব্যবস্থা কিন্তু সেই চির পুরাতন, কিনা "ছেলের বিয়ে দাও।" উমাশশী গালে হাত দিয়ে বললে, "এই বয়সে বিয়ে? যেন কেমন হবে, এখন পড়াশুনা করছে আর লেখাপড়াতে আমার দেবু বেশ ভাল তবে ঐ এক কি রোগে পেয়েছে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই পাগল।"

সবাই বললে "আহা ধর্ম্মের চেয়ে আছে কিরে বাপু! তা ধর্ম্ম ও কর আবার বাপের সংসার বংশটাও বজায় রাখ তবেই না ধর্ম্ম! আর দেখ বেশী সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যেতে দিও না। বিয়ে দিয়ে দাও, একটা সঙ্গী হবে, বাড়ীতে একটা ছোট ভাই বোনও নেই যে চারদণ্ড বাড়ীতে কথাবার্ত্তা কইবে। বিয়ে দিলে ছোট বৌটি রাত দিন ঘরময় ঘুরে বেড়াবে তোমারও ভাল তোমার ছেলেরও ভাল। এই আমাদের সব ঐ ধরণের বিয়ে হয়েছিল। আর ঐ বয়সে বিয়ে হলে, ভাবটাও জমে ভাল।"

উমাশশী এসব আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হ'তে না দিয়ে বললেন "সেকালে ওসব চলত একালে কি আর ভাল দেখাবে না দেবু রাজী হবে! সে সব হবেনা।"

কিন্তু মঙ্গলাকাঙ্খীর দল উদারতার চরম দেখিয়ে বললেন। "সে ভার আমাদের চলালেই সব চলে. আর দেবু? সে তুমি তাকে বললেই, সে বিয়েত দূরের কথা মরণকেও হাসিমুখে বরণ করে নেবে। দেবুর মত ছেলেকি আর আছে!"

এইবার উমাশশীর মনটাও দুলে উঠল কল্পনায় আবার যেন পুতুল খেলতে সাধ হল। মুখে বললেন, "তা সবাই মিলে আমার দেবুকে স্থিতি করে দিলেই বাঁচি, আমি আর কতদিন।"

দেবুর কোন আপত্তি টিকলনা। শুভলগ্নে পঞ্চমবর্ষীয়া অলকার সঙ্গে দেবুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। অলকার বাবা অলকার জন্মাবার তিন বৎসর পরেই বিপত্নীক হন। তদাবধি আর বিবাহ করেন নাই। জামাই মেয়েকে ঘরবাসী করে তিনি গেলেন বিবাগী হয়ে আর কোনদিন সংসার করেননি। কেউ কেউ বলত চট্টগ্রামের এক নিবিড় জঙ্গলে এক ভাঙ্গা শিব মন্দিরে নাকি অলকার পিতাকে দেখা যায়। মাতৃহারা অলকা শাশুড়ীকে পেয়ে মনে করলে তার মা ফিরে এসেছে সেই থেকে সে শাশুড়ীর অঞ্চলের নিধি হয়ে রইল। উমাশশীর একদণ্ড অলকাকে ছেড়ে কোথায় যাবার যো নাই। উমাশশীর গৃহ এবার অলকার কথায় গানে খেলায়—আনন্দ মূর্ত্ত হয়ে উঠল। আবার নূতন করে হাসি অশ্রুর সম্মিলন হল। দেবব্রত এইবার সত্যাই ঘরবাসী হয়ে পড়ল। তার একমাত্র চিন্তা অলকাকে কি দিয়ে খুসী করবে। ছোট ভাইবোন কখনও সে পাইনি। পাড়ার পাঁচটা পাঁচরকমের ছেলের সঙ্গেও পিতা কখনো মিশতে দেননি। কাজেই আজ এই সুন্দর ছোট মোমের পুতুলের মত অলকাকে পেয়ে তার কৈশরের সমস্ত স্নেহ একীভূত হয়ে সারা হৃদয়টা অলকাময় হয়ে গেল। যখন পাড়ার বৈষ্ণবরা গান করত।—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী করেছি সার
আমার কিশোরী পূজন কিশোরী ভজন
কিশোরী গলার হার।

দেবব্রতর মনে হত – অলকাই আমার কিশোরী। দুজনে এক স্বর্গীয় স্নেহে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। শিশুর প্রেমে মলিনতা নাই। সে প্রেমের তুলনা নাই।

যতটুকু দেবব্রত স্কুলে থাকে, মাত্র ততটুকু দুজনের ছাড়াছাড়ি। সারাদিন খেলা করে। দুজনে নিঝুম রাতে চাঁদের দেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের বুকের কাছে তারা ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু এমনি করে বেশীদিন গেলোনা। দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়ে উমাশশীর হঠাৎ একদিন—বিশ্বনাথ দর্শনেচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। তখন অনেক লোক কাশীতে যাচ্ছে, কি একটা যোগে স্নান করতে। কলকাতার গঙ্গায় স্নান উমাশশীর মনঃপুত হলনা। অনেকগুলি দলবলও জুটল, যাবার দিনও স্থির হয়ে গেল। দেবব্রত ও অলকাকে দেখবার জন্য তাদের এক মাসীকে ক'দিনের জন্য আনানো হল, কিন্তু যাবার সময় অলকা মহা কান্নাকাটি সুরু করে দিলে সে বায়না ধরলে।—

"মা চলে গেলে সে খাবেনা নাইবেনা কেবল পড়ে পড়ে কাঁদবে।"

অগত্যা কিছুতে অলকাকে শান্ত করতে না পেরে উমাশশী অলকাকে নিয়েই চললেন। একবার ভাবলেন, না গিয়ে কাজ নেই কিন্তু তখন "গতস্য শোচনা নাস্তি।" ভাববার সময় নেই ট্রেনের সময় হয়েছে। সদরে গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে।

দেবব্রত যখন দেখলে মার সঙ্গে অলকাও চললো তার মন কি এক অজানা ব্যাথায় আশঙ্কায় অধীর হয়ে উঠল সে ছুটে গিয়ে মাকে বললে—"মা মা ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ"? মা ছেলের ব্যথাকাতর মুখপানে চেয়ে বল্লেন "কেন রে তোর মন কেমন করছে"? লজ্জিত হয়ে দেবব্রত তাড়াতাড়ি বল্লে। "না না সেজন্য নয় ও যে ভারী অস্থির, তোমায় বড় জ্বালাতন করবে তাই বলছি। অলকা এইবার দেবব্রতর পানে চেয়ে বলে উঠল "আহা আমি বুঝি দুষ্টু। তুমিও চলনা তা'হলেত দেখতে পাবে

জ্বালাতন করি কিনা।" অলকার শিশু হৃদয় বিচ্ছেদ আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ল। সে মায়ের দিকে ফিরে বল্লে "মাগো ও কেন যাচ্ছে না আমার ভাল লাগছে না।"

মা হেসে বললেন।—

"তবে তুমি থাক লক্ষী মা আমার।"

অলকা ছোট ফুলের মত মুখখানা বেঁকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বললে।

"সে হবেনা মা আমি যাবই তবে শীগগীর চলে আসব কেমন মা?" দেবব্রতর মুখপানে চেয়ে চেয়ে অলকা ঠিক করতে পাচ্ছেনা য থাকবে কি যাবে। কিন্তু সময় নেই।

মা বললেন "দেবব্রত আসি বাবা, দেখতে দেখতে কটাদিন কেটে যাবে।" মনে মনে ভাবলেন আমার আবার তীর্থধর্ম্ম কেন? ষোল আনা মন সংসারে পড়ে আছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মুছলেন। গরুর গাড়ী ষ্টেশন অভিমুখে চলল।

দেবব্রত ও অলকা শুধু পরস্পরের পানে চেয়ে রইল। মৌন মূক ভাষা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে বুকের স্পন্দন দ্রুত জানিয়ে দিলে এই স্পন্দন বুঝি শুধু বয়ে যায় যুগ যুগান্তর ধরে সময়ের সীমার পারে যতদিন পর্য্যন্ত স্থূল থেকে সূক্ষ্মে পরিণত না হয়। তাই ললাট পটে স্মৃতির রেখা অদেখা ভবিষ্যতে গিয়েও বুঝি পৌঁছেছিল। হায়রে নিঠুর ভাগ্যচক্র এমন করে প্রাণের জিনিষ তুমি ছাড়া আর কে কেড়ে নিতে পারে? কে জানত যে অলকা আর তার বড় সাধের ঘরে ফিরবে না? কিন্তু দেবব্রতের প্রাণ অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁদে উঠেছিল। যখন চোখের সামনে থেকে গরুর গাড়ীখানা অদৃশ্য হয়ে গেল দেবব্রতর

মনে হয়েছিল যেন একখানি যবনিকা পড়ে গেল আর গভীর জমাট অন্ধকার ভেদ করে কিছু যেন দেখা যাচ্ছে না একবার মনে হল সব ফেলে মায়ের সঙ্গে যাই কিন্তু তা হলনা শুধু তার বুক ঠেলে রুদ্ধ বেদনা চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়ে দিলে। একবার সে ভাবলে ছিঃ কেউ যদি দেখে ফেলে আমি কাঁদছি তবে সবাই বলবে ঠাট্টা করবে যে বৌ এর জন্য কাঁদছে, কেউ কি আর বলবে মার জন্যে? মার জন্যও যে মন কেমন করছে না এমন নয় কিন্তু এমন সময় অলকা যে তাকে সুস্থির হ'য়ে বসতে দাঁড়াতে দেয় না, কেবল অনর্গল আবোল তাবোল বকে যায়, আর খেলবার জন্য বেড়াবার জন্য অনুরোধ করে। সেদিন দেবব্রতর খাওয়া হোল না, পড়াশুনা হোল না, কেবল সারারাত শুয়ে শুয়ে অলকার কথাই ভাবলে! শেষরাত্রে স্বপন দেখ্‌লে অলকা যেন ভারি কাঁদছে, সে কি বুকফাটা কান্না! ঘুম ভেঙ্গে দেখলে ভোর হ'য়ে গেছে। কিন্তু অলকা শূন্য গৃহ অসহ্য, তাড়াতাড়ি একখানা বই নিয়ে পাশের বাড়ীতে এক প্রতিবেশীর কাছে পড়তে গেল।

এদিকে নির্দ্দিষ্ট দিনে তীর্থযাত্রীর দল ৺কাশীতে পৌছাল, কি ভিড়, লোকে লোকারণ্য দাঁড়াবার বসবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, উমাশশী অলকাকে নিয়ে বড় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন, তাইত নিজেরা যা হয় ক'রে কাটান যায়, কিন্তু এই বাচ্চা মেয়ে নিয়ে কি করা যায়? উমাশশী স্থির করলেন কোন রকমে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন করেই বাড়ী অভিমুখে রওনা হবেন।

উমাশশীর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা উমাশশীকে বললেন যে দিদি আমরা সবাই আগে ডুব দিয়ে আসি, পরে তুমি যেয়ো, আমরা যে

কেউ হয় অলকাকে নিয়ে থাকব তুমি স্নান ক'রে আসবে'খন, যা ভিড় বিশ্বনাথ দর্শন দেন কি না দেন। অগত্যা উমাশশী অলকাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলেন; সকলে স্নান করতে চ'লে গেলেন। সেই ভোরবেলা অলকা একটু দুধ আর মিষ্টি খেয়েছে, বাছাকে কখন যে চারটী খেতে দেবেন উমাশশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। কত লোক স্নান করে ফিরে যাচ্ছে কিন্তু উমাশশীর দলের স্নানার্থিনীরা আর ফেরে না। সঙ্গে মাত্র একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তিনিও গেছেন স্নান করতে। উমাশশী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, ক্রমে বেলা পড়ে আসে। কারুর দেখা নেই। উমাশশী অলকাকে বল্লেন অলকা এইখানে একটু দাঁড়াও আমি চট করে একটা ডুব দিয়ে আসি, ওরা এলেই তোমার খাবার ব্যবস্থা করব। ঘাটের দিকে গিয়ে কাজ নেই, ভারা পেছল, ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে থাক। অলকা রাজী হল। উমাশশী অলকার মুখপানে বারবার চাইছিলেন। তাই ত মেয়েটার মুখ ভারি শুকিয়ে গেছে। অলকার পানে সকলেই চেয়ে চেয়ে দেখছে, কেউ কেউ বা জিজ্ঞাসা করছে "এমন সুন্দর মেয়েটী কার গা? উমাশশী অলকার মুখ চুম্বন করে উত্তর দেন। "আমার মা আমার।"

উমাশশীর একবার যেন মনে হল, এত ভীড়ে বাছাকে না ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। একবার ফিরে গিয়ে অলকাকে বুকে তুলে নিলেন। অলকা সাশ্চর্য্যে বল্লে "ও কি মা তুমি নাইলে না?"

উমাশশী আবার অলকাকে দাঁড় করিয়ে গভীর স্নেহে একটী চুম্বন রেখা তার মুখে মুদ্রিত করে দিয়ে বললেন "এই যে যাই" কিন্তু প্রাণের ভিতর কেমন যেন তোলপাড় করতে লাগ্‌লো। কি করেন কিছু ভেবে না

পেয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে চললেন। জলে গিয়ে নেমেও অলকাকে দেখা যেতে লাগল কিন্তু মাঝে মাঝে ভিড়ে যেন অলকাকে ঢেকে দেয়। তাড়াতাড়ি দু'তিনটা ডুব দিয়ে আবার চেয়ে দেখেন কই অলকা ত সেখানে নেই। কোনরকমে ভয়ে ত্রস্তে একরকম পাগলের মত ছুটে এসে দেখলেন কি অলকার কোন চিহ্ন নেই। তবে নিজেদের দলের লোক তাকে একলা দেখে নিয়ে গেছে নাকি। আর এরি মধ্যে যাবেই বা কোথা; চারিদিকে ছুটাছুটি ক'রে যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞাসা করেন "হ্যাঁ গা, এইরকমের একটী মেয়েকে দেখেছ?"

কেউই বলতে পারে না। একজন বৃদ্ধা শুধু বল্লে "একটী ছোট্ট ফুট ফুটে মেয়েকে তার মা কি কে হবে জানি না, কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটী তার পিছু পিছু ছুটে ঐ ঘাটের দিকেই যেন গেল।"

এমন সময় উমাশশীর সাথীরা যখন এসে বল্লে "কই গো অলকা কোথায়? বাছার জন্য খাবার এনেছি। বড় দেরী হ'য়ে গেল; একেবারে বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে এলুম কিনা।"

উমাশশীর সম্মুখে তখন সারাবিশ্ব ঘূর্ণিয়মান; কারুর কথা হয়তো তার কাণে গেল না। সংজ্ঞাহারা হ'য়ে সেইখানেই প'ড়ে গেলেন। সকলে ব্যাপারটা অনুমান করলে, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন তারা ফিরে এসে ভাবছে পুলিশে খবর দেবে। এমন সময় শুনলে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ভেসে উঠেছে। সকলে দেখতে গেল কিন্তু অলকাকে পেলে না। সঙ্গের প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী পুলিসে খবর দিতে চললেন। সারারাত তাঁদের সকলের যে অবস্থায় কেটেছিলো সেটা বর্ণনাতীত! কিন্তু যখন সকাল পর্য্যন্ত উমাশশীর জ্ঞান হোল না, সকলে

ভারী ভয় পেয়ে গেলেন। তাইত মেয়েটা গেল, আবার এই উমাশশীও না সরে পড়ে। সকলে বল্লে অলকা কোথায় আর যাবে? তাকে বিশ্বনাথ নিয়েছেন। ঐ জলেই সে ডুবে গেছে।

সকলে পরামর্শ করে ফিরে চলেন। উমাশশীর মাঝে ২১ বার জ্ঞান হয়েছিল, মুখে শুধু অলকা বলে চারিদিকে চেয়ে সেই যে অজ্ঞান হয়েছেন সে ঘোর আর কাটল না।

দেবব্রত যখন দেখ্‌লে অর্দ্ধমৃতা মা ফিরে এলেন, সঙ্গে অলকা নেই তখন সবটুকু শুনে সে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। মাত্র এই কয় ঘণ্টার ব্যবধানে অলকা কোথায় গেল? কেউ কি তাকে চুরি করে নিলে? জলে ডুবে গেল। উঃ আর ভাবতে পারা যায় না। কেন এমন হোল। কেন সে মায়ের সঙ্গে এল না! অনেক ভেবে অনেক কেঁদে সে মনকে বাঁধল যে অদৃষ্টের সঙ্গে মানুষকে চলতে হবে। বেশ তাই হোক্ সংসারে যে যা ভাল হয় তাই করে যাব কিন্তু নিজেকে আর হারাব না। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু যখন আমার সকল আনন্দের বাধাস্বরূপ তখন আর এই ক্ষনস্থায়ী সুখে উন্মত্ত হই কেন?

অলকার তিরোধানে দেবব্রতর ক্ষুদ্র বুক খানা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। কেবল তার মনে হয় কাশীতে গিয়ে প্রত্যেক জায়গাটী খুঁজলে হয়তো তাকে পাওয়া যাবে। যাকে বলে সেই জবাব দেয় "দূর পাগল, তাহ'লে পুলিসে এতদিন ঠিক খুঁজে বার করত।

উমাশশী স্বামীর শোক বুকে চেপে আবার উঠেছিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ অলকার শোক তিনি কিছুতে সহ্য করতে পাচ্ছেন না। তিনি যে নিজহাতে তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছেন। আবার সংসার—না কখনই না।

দেবব্রত বেঁচে থাক—সে পরে ভুলে যাবে, আবার সংসারী হবে কিন্তু উমাশশীর আর যে কোন সাধ যায় না, উমাশশী দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলেন।

দেবব্রত পড়াশুনা সবই করে, কিন্তু তার যেন মনে হয় সবই নিষ্ফল কি যে সে খোঁজে কি যে চায় যেন বুঝতে পারে না। এবারে মা ও ছেলে দুজনেই কলকাতায় গেলেন—দেবব্রতের কলেজে পড়ার সুবিধার জন্য, ছুটি হলে মাতা পুত্রে দেশে যেতেন দিন কারো অপেক্ষাও করে না ক্রমে দেবব্রত এম এ, পাশ করে কলকাতাতেই প্রফেসারী করতে লাগল। তার অনেক বিবাহের সম্বন্ধ এল, কিন্তু দেবব্রত কিছুতে রাজী হয় না। তার নিষ্ফলতার ভেতর যেন উপলব্ধি করলে সে এক নূতনের মধ্যে এসেছে। অলকার উপর সেই স্নেহ যেন আজ অন্তরে গর্জ্জন ক'রে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে চায়। সে তার সকল উচ্চলক্ষ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বের কল্যাণ কামনায় আর্ত্তের সাহায্যে উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প করলে। কিন্তু হঠাৎ তার এই সঙ্কল্পে বাধাপড়ল। তার মাসীমা একদিন দেবব্রতকে ডেকে বললেন "ওরে দেবু, তুইত খুব ঘটা ক'রে স্বদেশী, পরোপকার এই সব করে বেড়াচ্ছিস, এদিকে কবরেজ মশাই তোর মাকে কি ব'লে গেছেন শুনেছিস কি?"

দেবব্রত ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠল, "কেন মাসীমা, কবরেজমশাই কি ব'লে গেছেন?" "তিনি ব'লে গেছেন দিদি আর বেশীদিন নয়। বৌটা যাবার পর দিদিত আর শরীরকে শরীর জ্ঞান করেনি, সে সব অত্যাচার অনাচার গুলো যাবে কোথায়?"

"কেন, কেন কি হয়েছে কি?"

"হয়েছে শিবের অসাধ্য; কবরেজমশায়কে ডেকে শুনগে যা দিদির যে সব বাড়াবাড়ি। বউ কি আর কারুর যায় না বাপু! ছেলের খে-থা-দাও তা নয়। মা রইলেন শুয়ে, ছেলে গেল পরোপকার করতে। এখন যা হয় বিলি কর আমার হয়েছে জ্বালা।"

দেবব্রত মাসীর সঙ্গে বেশী বাক্যালাপ না ক'রে গেল মায়ের কাছে। গিয়ে যা দেখলে তাতে তার চক্ষু স্থির হ'য়ে গেল। মা দেবব্রতরই একখানা ছবি নিয়ে অঝোরে কাঁদছেন। দেবব্রত ছুটে গিয়ে মায়ের কাছে বসে প'ড়ে ডাকলে—

"মা, মা, তুমি অমন করে কাঁদছ কেন?"

অতিকষ্টে উমাশশী সংযত হ'য়ে বললেন "বাবা দেবু, আমি মরবার আগে তোমায় সংসারী দেখে মরতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু আমি আর তোমার বিয়ের উজ্জুগ করব না। তুমি পরে বিয়ে করো। তোমার পিতার নাম রেখো। বংশ রেখো বাবা। সংসারে থেকেও মানুষ পরোপকার ধর্ম্ম সবই পালন করতে পারে।" দেবব্রত দেখলে মা সত্যই এবার পরপারের যাত্রিনী, কোন যত্ন সেবা ও স্নেহের আকর্ষণে তাঁকে আর ধরে রাখা যাবে না, এখন তার পরম ধর্ম্ম মাকে সুখী করা, নিজেকে বলি দিয়েও সে তাই করবে। মায়ের রক্তশূণ্য অশ্রুসজল মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"মা তুমি যাতে সুখী হও আমি তাই করব মা তুমি অমন ক'রে কেঁদো না।"

"বাবা আমার যে বেশীদিন মেয়াদ নেই, তবু যাবার আগে যদি—"

দেবব্রত বাধা দিয়ে বল্লে "না, মা, ও কথা বলো না। পরোপকার, দেশোদ্ধার সব তোমার পায়ে ফেলে দিচ্ছি। মার মনে কষ্ট দিয়ে কেউ

কখনো ধর্ম্ম বা শান্তিলাভ করতে পারে না। মা আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে তুমি শুধু অনুমতি দাও আমি কি করতে পারি তোমার জন্যে।”

মায়ের মুখে সুখ শান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়া ফুটে উঠল। বড় মধুর হেসে বললেন “বাবা দেবু, ছেলের মত ছেলে তুমি আমার। দেবতাশ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথের মানসিক ক’রে তোমায় পেয়েছি; জানি তোমায় কিন্তু এখন তুমি সুস্থির হও। কাল তোমায় সব বলব। আজ শরীর বড় দুর্ব্বল মনে হচ্ছে।” বলেই উমাশশী সেইখানে শুয়ে পড়লেন। দেবব্রত তাড়াতাড়ি মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখলে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে আকুল হ’য়ে ব’লে উঠল—

“একি মা তোমার এত জ্বর! তাই মাসীমা বলছিলেন কবরেজ মশাই কি সব বলেছেন।”

“ওসব কিছু না, বয়েস হ’লে অমন হয়।”

দেবু এ বয়সেও শিশুর মত কেঁদে মায়ের পা জড়িয়ে ধরলে “মা, মা, আমার যে আর কেউ নেই, তুমি আমায় ফেলে যেও না।”

দেবব্রতর কান্না দেখে উমাশশী আবার মনের জোর ক’রে উঠে বসলেন। দেবব্রতর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—

“ছিঃ বাবা, বাপ মা কারো চিরদিন থাকে না। তবে তোমায় সত্যই বড় একা রেখে যাচ্ছি, এই কথা মনে হলেই আমার মরতে ইচ্ছা যায় না। কিন্তু মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, আমায় যেতেই হবে। যদি তোমায় কারো হাতে সঁপে দিয়ে যেতে পারতাম বাবা তবে……তবে ·· বড় শান্তিতে মরতাম।” দেবব্রত প্রকৃতিস্থ হয়ে চোখ মুছে বল্লে “এরি

জন্য তুমি এত ভাবছিলে মা ? কেন মাসীমা আছেন, আরও মামাবাবুরা পিসিমা”—উমাশশী বাধা দিয়ে বল্লেন—“না না দেবব্রত তুমি বুঝেও বুঝতে চাও না, কিন্তু বাবা আমার বলবার যে মুখ নেই, নইলে সকলেই বলে “হ্যাঁগা ছেলের বে দাও, নইলে ঘরে ছেলের মন বসবে কেন ?” কিন্তু বাবা আমার বরাতে বউভাগ্যি নেই, তা যদি হবে অমন সোনার প্রতিমাকে আমি জলাঞ্জলি দিই।”

দেবব্রত দুঃখিত হ’য়ে বল্লে—“আর পুরানো কথা তুলে কি হবে মা ? সে দুদিনের জন্য এসে শুধু স্মৃতি রেখে গেল।” দেবব্রত এই কথা বলেই উন্মনা হ’য়ে ভাবে,—কি আশ্চর্য্য ! সেই শিশুর মুখ যে এতদিনেও ভুলতে পারা যাচ্ছেনা, যেন এখনও মন বলে, সে আছে, সে আছে। যেন স্বপ্নের মত সে আসে—আবার চলে যায়—এখনও সে যেন তার নাম ধরে কাঁদে ! তাকেত হারিয়েছি আর পাওয়াই যদি যাবে না তবে কেন এ আকুলতা, কেন আমার পাগল দুটী আঁখি এই বিপুল জনস্রোতের মাঝে তাকে খুঁজে বেড়ায় ! এই মনের গতি কিসে রোধ হয় ?” দেবব্রতকে ভাবতে দেখে উমাশশী বলেন “দেখ দেবু ! স্মৃতিকে যত প্রশ্রয় দিবি সে তত পেয়ে বসবে। তার কথা আর ভাবিস নি। সংসারে অমন করলে সংসার যে অচল হ’য়ে পড়বে। তুই চিরদিনই ভাবুক, এক কোঁটা একটা মেয়ের জন্য তুই যে আর বিয়ে করবিনি এতো লোকে বুঝবে না। এমন কি আমিই আশ্চর্য্য হয়ে যাই।” দেবব্রত তাড়াতাড়ি ব’লে উঠল “তবে তুমি কেন তার কথা মনে করে দেহ নষ্ট করলে ? আমি অত ভাবতে পারি না, তবে ঐ বে—থা ক’রে সংসার করা যেন আর ভাল লাগে না মা।”

"তবে আর আমায় বলিস কেন? যে মা যা বলবে তাই?"

"তা ত এখনো বলছি, বেশ তুমি কি চাও বল?"

"আমি চাই, তুমি পাঁচজনের মত সংসারী হও, আমারও সংসার বজায় থাকে, আর তোমাকেও দেখবার, টানবার লোক হয়। এখন বয়েস আছে ঝোঁকের মাথায় যা ইচ্ছা করছ কিন্তু একদিন তুমিও বুঝবে, যে একজনকে জীবন যাত্রায় দরকার।"

"কিন্তু মা জীবন যাত্রায় যাকে বরণ করা হ'বে সে যদি তেমন না হয়, তখন?"

"না, সে মেয়ে কখনো তেমন হবে না। সে তুই যা বলবি তাই করবে; বেশী লেখাপড়া সে না জানলেও স্বামীকে খুব যত্ন করবে।"

দেবব্রত আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে "মা তুমি কি বলছ, জীবন যাত্রা বলতে বলতে একেবারে একটা লোককে দাঁড় করালে। আবার তার বিষয় অনেক কিছু জান বলছ! ব্যাপার কি বলত?"

"ব্যাপার নতুন কিছুই নয়, আমার ইচ্ছা তুমি সংসারী হও। তোমার মাসীমার সম্পর্কে এক দেওরঝি আছে, তার নাম 'বিজনবাসিনী' দেখতে খুব ভাল না হ'লেও চলনসই, কিন্তু গেরস্থর মেয়ের যতটুকু থাকা দরকার তা বোধ হয় সবটুকু আছে। তোমাকে সে ঠিক চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে। বাপ, মা, ভাই সব বর্ত্তমান, বাপের টাকাকড়িও বেশ আছে। তারাও খোসামোদ করছে এখন তোমার মত হলেই হয়।" দেবব্রত কিন্তু তেমনি নীরব। মা পুনরায় স্নেহমাখা কণ্ঠে বল্লেন—"মেয়েটিকে একবার দেখবি?"

"না না তোমার মতেই আমার মত, তুমি এখন সেরে উঠ। তারপর হবে খন।"

"না দেবু তা হবে না। তাদের মেয়ে বড় হয়েছে। তারা আর রাখতে পারবে না। এই মাসেই বিয়ে দিতে চায়।"

"তোমাদের দেখছি সবই তৈরী। শুধু আমার বিয়ের অনুষ্ঠানটা সারবার অপেক্ষা। বেশ তাই হবে। আচ্ছা তুমি এখন শোও, আমি একবার কবরেজের কাছে যাই।"

বলেই দেবু উঠে পড়ল, উমাশশী ডেকে বল্লেন,

"ওরে শোন্ শোন্, আজ আর যাসনি, কাল তখন দেখা যাবে।" কিন্তু দেবব্রত তখন চলে গেছে।

কবিরাজের দেখা না পেয়ে ফিরে এসে দেবব্রত তার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাবে, সত্যিইত, বাঁচতে গেলে সব চাই। মিছে কল্পনায় অভিভূত হ'য়ে জীবনটা নষ্ট করি কেন? এমন একঘেয়ে জীবন ভালও লাগছে না। আজকাল কোন প্রতিষ্ঠানে আশ্রমে যোগ দেওয়াও এক বিপদ, কেবল ঝগড়া, তর্ক খোসামোদ, তার চেয়ে সংসারাশ্রমই মুনিঋষির মতে বরণ করে নেওয়া যাক, আহার ওষুধ দুই হবে।

যথা সময়ে দেবব্রতর আবার বিবাহ হয়ে গেল—বিজনবাসিনীর সঙ্গে, পাঁচজনের মত তারাও ঘর সংসার পাতলে। দেবব্রতর প্রথম ছেলে ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই উমাশশী দেহ রাখলেন; স্বর্গে বাতি জ্বলল।

দেবব্রত খুব কাতর হ'য়ে পড়লেও সংসার তাকে বেঁধে রাখলে। পতিপ্রাণা বিজনবাসিনী স্বামীর শোক মুছিয়ে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে তাঁকে সুখী করবার জন্য এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়ালেন। ক্রমে দেবব্রত

আবার পাঁচজনের মত পুরদস্তুর সংসারী হলেন। কিন্তু পরোপকার ব্রতটী ছাড়তে পারলেন না। দুঃখী গরীব অসহায় দেখলেই তার প্রাণ কেঁদে উঠত। অনেক সময় এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে মতান্তর ঘটত কারণ বিজনবাসিনী ঘোর সংসারী, অতিরিক্ত দান আর পরোপকারটা তার কাছে বাজে খরচ ও অদ্ভুত খেয়াল ব'লে পরিগণিত হত। যা'হোক এমনি করে দিন কাটতে লাগল। তারপর কোলের মেয়ে জন্মাবার ছয় বছর পরে তারা কাশীতে বেড়াতে এলেন।

কাশীতে এসেই দেবব্রতর সেই সব পূর্ব্বস্মৃতি অতীতের ঘটনা মনে পড়ে যেতে লাগল। মুখে কিছু না বল্লেও মন ভারি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল। এই সেই কাশী এখানেই মা অলকাকে হারিয়েছেন—সেই অলকা এখনো মনে পড়ে যায়! সে দিন মায়ের সঙ্গে সেই শেষ গরুর গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসল! সেই টুক টুকে লাল সাড়ী পরা, সিঁথিতে সিঁদুর, ঠিক যেন সেই ছবির রাধিকা। লোকে শুনে হাসে হাসুক, কিন্তু মনে যে পড়ে যায় মন কি কারো বাঁধা ধরার ভেতর থাকে? না আইন কানুন ধর্ম্মাধর্ম্ম বাধা বিপত্তি মেনে চলে? আচ্ছা হঠাৎ যদি অলকাকে দেখতে পাই। তাকি হয় না?

এমন সময় বিজনবাসিনী এসে ডেকে বল্লে "কি ভাবছ? এস একবার ফাগুয়াকে সঙ্গে ক'রে বাজার যাও; অনেক কিছু আনতে হবে! আকাশ যা মেঘ করেছে!"

বাজার হাট হবার পর সারাদিন গেল। রাতে এই ঘটনার সূত্রপাত। যাক্ পরদিন সকালে দেবব্রত ঘুম থেকে উঠে ভাবতে লাগল সেই মেয়েটির বাড়ী যাওয়া উচিত কিনা?—তাইত—

আমি যতই তাকে অলকা মনে করি বাস্তবে দেখতে গেলে তা কখনই নয়, তবে কল্পনায় সব হ'তে পারে, কিন্তু কল্পনায় এতদূর এগোন উচিত কি ? শেষে একটা গোলমাল হবে, অমন বিপদ অনেকেরই হয়। কাল রাতে নিজে মেয়েটির সঙ্গে না গিয়ে মধুকে পাঠালেই হোত। মিছে বিজনবাসিনীর মনে আঘাত দেওয়া—নাঃ মন শক্ত করতে হবে। মেয়েটির ওখানে যাওয়া হ'তে পারে না ; লোকে বলবে কি ? মেয়েটি না হয় বিপদে প'ড়ে তাকে ডাকতে এসেছে, তার মাথার ঠিক নেই। তা ব'লে আমি জানি না শুনিনা একজন পরস্ত্রীর সাহায্য করতে ছুটব ? না ! না, এ আমার মনের দুর্ব্বলতা ! তবে মেয়েটিকে আশা দিয়েছি, তখন একবার তার খোঁজ করা উচিত। বরং ঝিটার কাছেই আগে যাই যার কাছে অলকা যেতে বলে গেছে সেই "বাঙ্গালী টোলায় ক্ষিরী ঝি এর সন্ধানে"। দেবব্রত তাই ঠিক করে বাঙ্গালীটোলার উদ্দেশ্যে চলল।

খোঁজ করে সে ঝিয়ের সাক্ষাৎ পেলে, একাত্তর বছরের বুড়ী ঝি, কিন্তু একদম ভেঙ্গে পড়ে নি, শক্ত আছে। দেবব্রতর সঙ্গে তার অনেক কথাই হোল। সে কথা সব শুনে দেবব্রত একরকম পাগলের মত হ'য়ে গেল ; অলকা যে বেঁচে আছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। অলকাকে একবার দেখবার জন্য তার প্রাণ অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল। কেন তা বলছিঃ—বুড়ো ঝি প্রথমে দেবব্রতকে জিজ্ঞাসা করলে—

"অলকাকে কেমন করে চিনলেন ? সে কেউ হয় আপনার ?" দেবব্রত পিছ পা' হলো না বল্লে—

"চিনি বই কি ! না চিনলে আর এলাম কি করে ? এখন অলকার খবর কি বল ত ?"

ঝি বল্লে "বলছি, তা বাবু আপনি কি অলকার শ্বশুর বাড়ীর কেউ হন নাকি?"

"না, না, তবে শ্বশুর বাড়ীর ব্যাপার জানতেই ত এসেছি। অলকা আমাদের গ্রামের মেয়ে।"

"ও হরি! তাই বলেন বাবু, তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব বললে বিপদ আছে, আমার ঘরে চলুন। ঐ ত সামনেই ঐ ঘরখানা। বলেই ঝি দেবব্রতকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে মাটীর দাওয়ায় একখানি আসন পেতে বসতে দিয়ে কথা স্থরু করলে "ও বাবু তা এতোদিন কেন খোঁজ করনি?"

"খোঁজ পাইনি ব'লে?"

"তা বাবু কি করে খোঁজ পেলেন? সে ত আজকের কথা নয়। চেনা বড় শক্ত। ও কথায় ক্ষিরী ভুলবে না। আগাগোড়া না শুনে আমি বলছি না।"

"বেশ না বল, আমি চললাম। কিন্তু অলকার ভারি বিপদ, আর কাল রাতে আমি তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছি। কাল সে এসেছিল আমার কাছে।"

"তাই নাকি? তবে অলকাও আপনাকে চেনে? তা বাবু ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। আমি ত অনেক লুকোচুরি ক'রে বিয়া দিয়েছি। নইলে কুড়ানো মেয়ের কি ঐ যোগীন বাবুর ঘরে বিয়ে হয়?"

"কুড়ান মেয়ে! তাই জন্মেই ত তোমার কাছে এসেছি খোঁজ নিতে কত দিন আগে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?"

"আমি কি পেয়েছিলাম? আমার গিন্নি মা গঙ্গা নাইতে গিয়ে কুড়িয়ে পান।"

"সে আমি জানি, তুমি শীগগীর বল। বাজে কথা বেশী শুনতে চাই না, তারপর কি হোল ?"

তবে এই শোন বাবু—

"গিন্নিমার কাছেই ছেরদিন কেটে গেল, বাড়ীতে গিন্নিমা আর আমি থাকতুম। তিনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বেড়াতেন; তাঁর কেউ ছিল কিনা জানি না। একদিন কি একটা যোগ ছিল গিন্নি মা গঙ্গা চেনান করতে গেলেন, ওমা—সাঁঝ হয়ে গেল বাড়ী ফেরেন না—ভাবছি—এমন সময় হঠাৎ ঘরে এসেই গিন্নিমা দোর দিলেন, কোলে একটী আন্দাজ ৬৭ বছরের মেয়ে, আমি জিজ্ঞাসা করতেই বললেন,

"অনেক শোক তাপ পেয়েছিরে—যখন এ মেয়ে মা—মা—বলে আমার কাছে এসেছে—এ বাবা বিশ্বনাথের দেওয়া একটিফুল—দেখ—দেখ—কি রূপ—দেখ।" আমি ত অবাক। "গিন্নিমা কি ছেলে চুরি করেলন বুড়ো বয়সে ?" তখন গিন্নিমা বল্লেন—

"ওরে গঙ্গা নেয়ে ফিরছি,প্রায়ই বাড়ীর কাছে ঐ গলিটার মোড়ে এসেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম যে কে মা মা ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আমার পেছু পেছু আসছে। ফিরে দেখি, আমাকে মা মনে করেই ডাকছে। আমি কমণ্ডলু মাটীতে রেখে ছুটে গিয়ে বুকে তুলে নিলাম। বেশ বুঝতে পারলাম ভিড়ের ভেতর আমাকে মা মনে করে ছুটে এসেছে। কি সর্ব্বনাশ—মেয়ে কেঁদে অস্থির, কিছু বলতেও পারে না, অনেক খোঁজা হল, এখন গঙ্গার ঘাটে হারিয়েছে কি কোথা থেকে ঠিক হারিয়েছে মেয়েটী বলতে পারলে না। সবাই বললে যে "দেখ মেয়েটা কেঁদে কেটে ক্লান্ত হ'য়ে গেছে। ওকে তুমিই নিয়ে যাও, পুলিশে গেলে তুমি বিধবা

মানুষ অনেক হাঙ্গামা। যাদের মেয়ে তারা খোঁজ পায় নিয়ে যাবে। "আমরা এর জন্যে দায়ী রইলাম।"

গিন্নিমা ত মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মেয়েকে ত কেউ খুঁজতেও এল না।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করলেন—

আচ্ছা মেয়ে কি পরেছিল ?

"তা কি আর মনে আছে ? বাবু তবে মাথায় সিন্দুর ছিল, আমি মাকে বললাম। মা বল্লে না না ও সখ করে কে দিয়ে দিয়েছে।" দেবব্রত বল্লে—

"লাল কাপড় পরেছিল কি ?"

ঝি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে—

"হুঁ বাবু, এইবার ঠিক মনে পড়েছে। আপনি তাহ'লে অলকার কে হন ? দোহাই বাবু আমার হাতে না হাতকড়া পড়ে।"

"সে ভালই করেছ, এখন তারপর কি হোল বল।"

"তারপর ? তারপর অলকা মা মা করে দু'চারদিন খুব কাঁদতে লাগল। তাকে আমরা রাতদিন ভোলাতাম যে তুই স্বপ্ন দেখেছিস্ এই ত তোর মা। আরও অনেক কথা বলত। কিন্তু গ্রামের নাম বলতে পারেনি। কারুর পুরো নামই বলেনি। নইলে হয়তো মা খোঁজ করত। কেন না মেয়েকে দেখলেই মনে হয় ভদ্রলোকের মেয়ে, অলকা কিন্তু বলত আমি বামুনের মেয়ে, বাপের নাম অস্পষ্ট বলত। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই সে বাপের কথা বলত। আহা, বাছা বাপের কথা কোনদিন ভোলেনি। আর৺ বলত—বাড়ীতে মা আছে দেবু

আছে। আমরা বলতাম "দেবু—কে—রে ?" তা বলত "আমার বর।" আমরা ভাবতাম—আহা কার সঙ্গে হয়ত 'বর-কনে' খেলা করত। কিন্তু দিন দিন মেয়েটার আমাদের উপর মায়া পড়ে গেল। অলকা আগের কথা সব ভুলে গেল। মা কিন্তু অলকাকে কোথাও যেতে দিতেন না। নিজে সঙ্গে করে যেখানে যেতেন নিয়ে যেতেন। এমনি করে যখন ৯।১০ বছরেরটি হোল তখন মা তাকে স্কুলে দিলেন। এটা বেশ বুঝেছিলাম আমরা সে এ দেশের মেয়ে নয়। তা'হলে খোঁজ হোত, কোন বিদেশীর মেয়ে। তারপর মেয়ে লেখাপড়া করে—পাঁচজনের পাঁচটা কথা হয়—এ'ত বড় মেয়ের বিয়ে হ'ল না এই সব। শেষে গিন্নি মা স্কুল ছাড়িয়ে নিলেন। বাড়ীতে মেয়ে ঠাকুর দেবতা নিয়ে মেতে রইলো। গিন্নিমা বল্লেন ওকে আর বিয়ে করবে কে ? পূজা ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে থাক্। আমি ম'রে গেলে ওকে রামকৃষ্ণ আশ্রমে দিয়ে যাব। মেয়েকেও সেই রকম মানুষ করা হ'তে লাগল। কোন রকমে ঐ যোগীনবাবুর চোখে অলকা পড়ে। যোগীন বাবু অলকাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল আমরাও ভেবে দেখলাম হ'লেই বা বুড়ো —এমন ঘর বর কোথায় পাওয়া যায় এত বড় ধেড়ে মেয়ে বিয়েই বা করবে কে ? যোগীনবাবুও বেশী খোঁজ খবর করলেন না। মা বাড়ী টাকাকড়ি লিখিয়ে নিলেন, তবে অলকা কিছুতে রাজী হল না। বলে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে। আমার বর আছে এই সব। বল্লে বলে কেন, মা ই বলেছিলো যে বিশ্বনাথ আমার স্বামী তবে আমার দু'বার বিয়ে হবে নাকি। অনেক বুঝিয়ে মা রাজী করলে যে মনের সঙ্গে বিয়ে হয় বিশ্বনাথের আর দেহর সঙ্গে বিয়ে

হয় মানুষের। যা হোক বিয়ে ত হ'য়ে গেল। কিন্তু যোগীনবাবুর ছেলেরা কিছুতে অলকাকে ঘরে নেবে না। তারা ভারী গোলমাল শুরু করলে। তারা বল্লে যে ও টাকাকড়ি সামান্য নিয়ে আমাদের রেহাই দিক। লোকের কাছে আমরা পরিচয় দিতে পারছি না। বুড়োও শেষে রাজী হল। হঠাৎ গিন্নি মা গেল মরে। বুড়ো মানে যোগিনবাবুও বল্লে তাই ত কার কাছে অলকাকে ছেড়ে দেব? তা হয় না। বাড়ীতে এই নিয়ে মনান্তর চলল। তবুও এমনি করে কয়েক বছর কাটল—তারপর একদিন শুনলাম যোগীনবাবুর খুব অসুখ। তারপর আপনি ত সব জানেন।" হঠাৎ ঝি চেঁচিয়ে উঠল "একি বাবু আপনি কি ভিরমী গেলেন।"

সত্যই দেবব্রত অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে সে শুধু অলকা অলকা ক'রে উঠে বসল। কিন্তু বুড়ো ঝিকে আর দেখতে পেলে না। তাড়াতাড়ি উঠে সে ঝি—ঝি—ক'রে অনেক ডাকলে কিন্তু কোথায় ঝি কেউ নেই! পাগলের মত টলতে টলতে দেবব্রত অলকার বাড়ীর দিকে চলল। যখন অলকার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল তখন দেখলে বাড়ীতে অনেক লোক। একজনকে জিজ্ঞাসা করে শুধু জানলে বাবুর বড় অসুখ করেছিল—আজ জ্ঞান হয়েছে। অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে দেবব্রত বাড়ী চলে গেল।

দেবব্রত তিন দিন পরে চোখ মেলে দেখলে বিজনবাসিনী মাথায় আইস ব্যাগ নিয়ে ব'সে আছে। ছেলেমেয়েও মুখ পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে

ডাক্তারও সেইখানে। দেবব্রত ভাবে এ আবার কি ব্যাপার। ডাক্তার তখনি ব'লে উঠলেন "এই ত জ্ঞান হয়েছে—বেশ বেশ—হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে গেছল, তা এখন একটু কিছু খেতে দিন। আর ভয় নেই।" ডাক্তার কি একটা ওষুধ খাইয়ে হাত দেখে চলে গেলেন। ব'লে গেলেন "ছ'ঘণ্টা পরেই আবার আসব।" ছেলেমেয়েরাও খুব খুসী হল। সবাই ঘর থেকে চলে যেতে বিজনবাসিনী স্বামীর পা ধরে কেঁদে ফেললে, বললে "ওগো, আর কখনও আমি তোমায় ওসব বলব না। তুমি সেরে ওঠ।"

দেবব্রত যেন স্বপ্ন দেখছে, বললে "কি হয়েছে বল আমায়। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম।"

বিজনবাসিনী বল্লে—"না, না, স্বপ্ন দেখবে কেন? সকাল বেলা তুমি মেয়েটাকে দেখতে যাবে বলে বেরোলে, ফিরে এলে বেলা তখন দুপুর। কোন রকমে যেন টলতে টলতে এসে হঠাৎ সিঁড়িতে ঘুরে পড়লে। ভাগ্যিস ফাগুয়া পেছনে পেছনে আসছিল তাই রক্ষে। কাশীতে না এলেই হোত। তুমি সেই অলকার কথা আজও ভুলতে পারনি। অলকার ভাগ্যি ছিল ভাল; লোকে ঘরণী গৃহিণীর স্ত্রীর কথা ভুলে যায় আর তুমি কিনা সেই ছ'বছরের এক ফোঁটা মেয়ের ছেলেখেলা আজও মনে রেখেছ। আর ঘরই—বা কদিন করেছিল—দুবছর হবে—এইত। কি আশ্চর্য্য! এমন গল্পেও শোনা যায় না। সে কথা এখন যাক্, অজ্ঞান হ'য়ে অবধি শুধু, অলকা আর অলকা। যদিও সে মরে গেছে তবু কিন্তু বাবু আমার হিংসে হয় যাক্ পরোপকার করতে আর বারণ করছি না। বাবা! যা শাস্তি এ'কদিন পেয়েছি। বিশ্বনাথই জানেন।

দেবব্রতর চোখে ঘোর, জড়িত কণ্ঠে সে বলে উঠল—"কে বল্লে অলকা মরেছে, সে বেঁচে আছে।"

"বল কি? তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? না বাপু চল কালকেই কলকাতায় ফিরে যাই। আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

"না বিজু পাগল নয়, সত্যি বলছি সব মিলে গেছে। সে আছে, আছে, তাকে দেখেই চিনেছি।"

বিজনবাসিনী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর পানে চেয়ে বল্লে "সে কি? অলকা কোথায় আছে।"

"ছিঃ বিজন সে তোমার চেয়ে অনেক বড়; সে তোমার দিদি হয়।"

"আঃ আমার পোড়া কপাল, এখন নতুন করে আবার কাকে দিদি বলব। কি যে বল তার ঠিক নেই, আমাকে রাগাচ্ছ কেন?"

"না বিজু সত্যি, আমি অলকাকে না দেখতে পেলে ম'রে যাব।"

এইবার সতী সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর ব্যাকুলতা সহ্য করতে পারলে না। বল্লে "বেশ তা তুমি যা চাও, যাতে সুখী হও আমি তাই করব। কিন্তু আজ একটু স্থির হও। কাল তোমার অলকা কোথায় আছে বলো। আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।" স্বামীকে যদিও বিজনবাসিনী আশ্বাস দিলে কিন্তু মনে জানলে যে স্বামীর মাথা খারাপ হয়েছে। শুধু তাই নয়; সে দিন রাত্রে সেই স্ত্রী লোকটী তার স্বামীকে গুণ করেছে। কিন্তু স্বামীকে বাঁচাতে হ'লে সব সহ্য করতে হবে। স্বামীর স্বভাব চরিত্র ত খুবই ভাল, তবে এমন হোল কেন? কিন্তু তবুও সঙ্কল্প করলে নিজে মরবে তবু স্বামীকে দুঃখ দেবে না। যদি কোন অপর স্ত্রীলোককেহ স্বামী চান তাকেই সে এনে দেবে। মন ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায়

যখন স্বামীকে বলতে শোনে "অলকা অলকা তুমি এসেছ।" স্ত্রীলোক স্বামীর ভাগ দিতে পারে না অথচ দিতে বাধ্য হয় উপায় নেই বলে। চেয়ে দেখলে স্বামী চোখ বুজে কি ভাবছে, বিজনবাসিনীর ভয় হোল। স্বামী বুঝি আবার অজ্ঞান হ'য়ে যাবে কিন্তু ডাকতেও সাহস হোল না। এমন সময় শুনতে পেলে তার মেয়ে ছবি কদিন গান গাইতে না পেয়ে মনের আনন্দে পাশের বারান্দায় ব'সে গান গাইছে—

"স্বপন সম এলে কি মম ঘুমেরই পারাবারে
ঢেউ গুলি তার দোলদিয়ে যায় মনেরই চারিধারে।"

বিজনবাসিনী মেয়েকে ধমক দিলেন,

"ছবু, এখন গান গাইতে হবে না। দেখছ না তোমার বাবার অসুখ; দেবব্রত বাধা দিয়ে বল্লে "আহা থাক্ না, ছেলেমানুষ মনের আনন্দে গান গাইছে। গানটা বেশ।"

তারপর ছেলেদের নিয়ে পাঁচরকম কথায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। ডাক্তার আবার এসে দেখে বলে গেলেন "এবার আর কোন ভয় নেই। তবে কাল সকালে যদি পারেন গাড়ী ক'রে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসতে পারেন। নৌকা ক'রেও বেড়াতে পারেন। মুক্ত বাতাসে বেড়ালে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হবে। রোগ ত কিছু নয়—অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায় এমনটা হয়েছিল।"

সে রাতটা কোন রকমে কেটে গেল। বিজনবাসিনী স্বামীকে অলকার কথা আর কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি, পাছে স্বামীর মনে পড়ে যায়. এক একবার শুধু ভাবে স্বামী কি এ বয়সে কারুর প্রেমে পড়লেন

না কি ? কে জানে পুরুষ মানুষের মন, এখন এখান থেকে চলে গেলেই ভাল।

যাহোক সকাল বেলা দেবব্রতকে বেশ সুস্থ দেখা গেলেও সে যে অতিরিক্ত চিন্তিত এটা তার মুখ দেখলেই অনুমান হয়।

সকলেই আনন্দ ক'রে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেল। ছেলেদের ও বিজনবাসিনীর সখ গেল নৌকায় চড়তে। নৌকায় সকলে মিলে যখন বসলে, দেবব্রতর খুব ভাল লাগল। সে ভাবলে সে হয়তো মিছে কতক-গুলো অনাহূত চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে পড়ছে। না, সে অলকার কথা আর ভাববে না। পরস্ত্রী সে। এটুকুই যথেষ্ট. তাকে ফিরে পাবার উপায় নেই। সে কালই এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য অলকাও স্বপ্ন দেখেছে যে আমিই তার একমাত্র আপনার জন। সে আকুল হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এল। আর আমি কিনা তার কিছু করতে পারলাম না।

বিজনবাসিনী স্বামীকে অন্যমনস্ক করবার জন্য বল্লে—"শুনছ কে গান গাইছে।"

সত্যই একজন যুবক আর এক খানা নৌকা বেয়ে গান গাইছে।

কোন সাগরের পার হ'তে
আসে কোন সুদূরের ধন
ভেসে যেতে চায় মোর মন
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।"

দেবব্রত বিকৃত কণ্ঠে বল্লে,—

"বিজন বাড়ী চল, আর ভাল লাগছে না। কাল কিন্তু আমি

অলকার খোঁজ করব। তুমি এই গঙ্গায় বসে সত্যি করে বল রাগ করবে কিনা, অলকাকে না দেখলে—"

বিজনবাসিনী স্বামীর হাত ধরে বল্লে "না রাগ কখনো করব না কিন্তু সত্যি করে যে কে এই অলকা জানতে ইচ্ছা করে।"

দেবব্রত দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে

"কে আবার! সে অলকা। আমার স্ত্রী।"

বিজনবাসিনীর মনে হল একবার গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—স্বামী অন্যে অনুরক্ত একি সহ্য হয়?

কিন্তু সহ্য করতে হবে, মুখে জোর ক'রে স্বামীর কথায় সায় দিয়ে বাড়ী ফিরলো।

এদিকে অলকা সে রাতে অনেক অনুনয় বিনয় করে স্বামীর পাশে এগিয়ে বসল। স্বামীর তখন বেশ জ্ঞান হয়েছে। অলকাকে দেখে স্বামীর মুখ বিষাদের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি অতিকষ্টে অলকাকে জানালেন

"দেখ অলকা, তুমি কোন আশ্রমে গিয়ে থাক, আমার মৃত্যু সন্নিকট, আমি মরে গেলে এখানে থাকা তোমার দুষ্কর তা তুমি বেশ বুঝছ, তোমায় বিয়ে না করে যদি—থাক্ সে কথা—আর এখন আমার এই অসুখ। এই বৃদ্ধ বয়সে রূপের মোহে বাড়ীতে অশান্তির আগুণ জ্বেলে দিয়েছি, আর তোমার মুখপানে চাইলে আমার বড় অনুশোচনা আসে। তোমার ত কেউ নেই যে তাঁর হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যাব এ যে কি যন্ত্রণা অলকা তুমি কি বুঝবে। তার চেয়ে তোমায় কোন আশ্রমে দিয়ে

যাই, তোমার ভাবনা থাকবে না। তোমায় বিয়ে করেছি মাত্র তুমি বিশ্বনাথের ছিলে এখনও তাই আছ।”

অলকা হাত জোড় করে বল্লে “আমি এখান থেকে চলে গেলেই যদি আপনি নিশ্চিন্ত হন, তবে—আমার কোন আপত্তি নেই আমায় বিশ্বনাথকেই দিয়ে যান।” “হ্যাঁ তাই দিলুম। আর এই নাও টাকা।”

“আমার টাকা কি হবে? আমার টাকাকড়ি কিছু চাই না, তবে আপনি অনুমতি দিন আমি বিশ্বনাথের কাছেই যাই।”

“হ্যাঁ তাই যাও। আমি তোমার নাম মাত্র স্বামী। বিশ্বনাথই তোমার সব। তিনিই তোমার ‘স্বামী’ পুত্র, বাপ, মা সব বুঝলে অলকা। আমি তোমায় প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করছি। তোমার নামে বাড়ী টাকা ছেলেদের কাছেই থাকবে, তুমি চাইলেই পাবে।”

ছেলেদের ডেকে যোগীনবাবু বল্লেন যে অলকা কোথায় থাকতে চায়, নিরাপদ যদি মনে কর তবে সেইখানে দিয়ে এস টাকাটাও দিও সেই সঙ্গে। ছেলেরা ভয়ানক খুসী হ'য়ে গেল তাদের পিতার সুবুদ্ধি দেখে। ভাবলে যাক মরবার সময় বাবার আক্কেল হল। বাপরে বাপ এ পাপ বিদেয় হলে বাঁচা যায়। ভাল আপদের পাল্লায় পড়া গেছে। কোথাকার কে ঘুঁটে কুড়োনি হয়ে বসল রাজরাণী, এখন যেখানে হয় বিদেয় হলে বাঁচা যায়।

মুখে খুব মিষ্টি করে তারা অলকাকে বল্লে “মা তুমি কোথায় যেতে চাও বল। আমরা বন্দোবস্ত করে দিই। আবার যখনি তোমার আসবার ইচ্ছা হবে তখনি আসবে তোমারই সব ইত্যাদি।”

অলকার প্রাণ তখন দেবব্রতকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে

উঠেছে। কতক্ষণে কাছে যাব, কতক্ষণে দেখা পাব। তাছাড়া সে আর কিছু ভাবতে পারলে না। যেন এই উপাস্য দেবতার অপেক্ষায় সে চিরদিন পথ চেয়ে বসেছিল। ছেলেদের সেদিন দেবব্রতর বাসা দেখিয়ে অলকা যখনমাত্র একবস্ত্রে স্বামীগৃহ ত্যাগ করলে তখন সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ী করেছিল। কিন্তু অলকা তখন ভাবলে না, যে দেবব্রত আশ্রয় দেবে কি না। তাহার স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে, সমাজ আছে। হায়রে, অলকা সত্যই জগতের বাইরে। তাই ভগবান তাকে এমন কাঙ্গালিনী করেছেন। অলকা শুধু ভাবে যখন স্বপ্নে বিশ্বনাথ দেখা দিয়ে আবার প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন, আর আমিও চিনতে পারলাম তখন দেবব্রত আমারই আর কারুর নয়। সে তখন ভাবলে না মানুষের কতটুকু সাধ্য, কতটুকু শক্তি। মানুষ হ'য়ে সমাজে থাকতে হ'লে কত ভাবতে হয়, বুঝতে হয়। অলকা যদি ভেবে দেখত তাহ'লে হয়'তো স্বামীগৃহ ত্যাগ করত না—কিম্বা ভবিষ্যতে এত আঘাত পেত না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, মানুষকে আঘাত দিয়ে কাঙ্গাল করে তবে কাছে টেনে নেন। কাঙ্গাল যতক্ষণ না বোঝে সে কাঙ্গাল ততক্ষণ সে কাঙ্গাল হয়েও কাঙ্গাল নয়। অলকা কাঙ্গালিনী হয়েও মনে করলে সে রাজরাণী।

সেদিন সন্ধ্যা আগত প্রায়, দেবব্রত অলকার খোঁজ নেবার জন্য বেরোবে, আজ কৃতসঙ্কল্প। বিজনবাসিনী কুটনা কুটতে কুটতে অঝোর ঝরে নয়নাশ্রু ফেলছে। কে সে অলকা যার জন্য স্বামী পাগল হয়েছেন, এমন সময় মধু এসে বল্লে—

"মা বাইরে গাড়ী ক'রে কারা এসেছেন।"

বিজনবাসিনী তাড়াতাড়ি। কুটনা বঁটি ফেলে রেখে বললে—"বাবুকে ডাক। গাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ আছে না কি?" মধু বল্লে "মনে হচ্ছে, তবে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।"

ইতিমধ্যে দেবব্রত উপর থেকে নেমে এসে দেখতে পেলে দুটী ভদ্রলোকের সঙ্গে অলকা গাড়ী থেকে নামছে। দেবব্রত মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গিয়ে বলে উঠল "কে? অলকা এসেছ?" বিজনবাসিনী কাঠের পুতুলের মত শুধু চেয়ে রইল। "এই অলকা" সধবা দেখছি, কি কাণ্ড! ভদ্রলোক দুজন সকলের মুখের ভাব দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে দেবব্রতকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি এঁকে চেনেন?"

"হ্যাঁ, খুব চিনি, ইনি আমাদের গ্রামেরই মেয়ে।"

যুবক দুজন আমতা আমতা করে বল্লে "তবু ভাল! এ পর্য্যন্ত ত এক বুড়ো মা ও এক বুড়ো ঝি ছাড়া এঁর আপনার লোকের কোন হদিশ আমরা পাই নি। তা বেশ মশাই, আমরা এঁকে এখানেই দিয়ে গেলাম। এঁকে আমরা এক আশ্রমে পাঠাচ্ছিলাম, তা ইনি এখানেই আসতে চাইলেন, এখন আপনি এর ভার নিচ্ছেনত? তবে টাকাকড়ি গহনা ওঁর যথেষ্ট ছিল কিন্তু ইনি কিছু নিলেন না। ওঁর যখনি যা দরকার হবে আমাদের জানাবেন। আচ্ছা মশাই এখন তবে আসি।" যুবক দুজন গাড়ীতে উঠবার সময় বলাবলি করলে,—

"বাবার যেমন কাণ্ড, একটা কোথা থেকে আপদ জুটিয়েছিলেন, ছিঃ ছিঃ বুড়ো বয়সে কি কেলেঙ্কারী। এখন দুর্গা বলে সরে পড়েছে এই ঢের।"

দেবব্রতর কেমন মুখ শুকিয়ে গেল। যে অলকার কথা ক'দিন ধরে ভেবে পাগল হয়েছিল সেই অলকাকে অতি নিকটে পেয়ে যেন তার ভয় হয়ে গেল। আর বিজনবাসিনী যে কি করবে ভেবে পেলে না, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেমেয়েরা সচকিত হ'য়ে তাকিয়ে বল্লে "হ্যাঁ, মা উনি কে ? অমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন,তোমরা বসতে বল্লে না।" তখন সকলের চমক ভাঙ্গল, দেবব্রত গলাঝেড়ে বিজনবাসিনীকে বল্লে—

"অলকাকে উপরে নিয়ে যাও, বিজন !"

বিজনবাসিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত অলকাকে শুধু বললে "আসুন উপরে।" অলকা দেখলে একি ! দেবব্রতর স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা, সংসার সবই ; আর সত্যইত তা—ই—বা থাকবে না কেন ? কিন্তু এখন উপায় কি— এদের আশ্রয়েই তাকে থাকতে হবে—সে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেবব্রত ও বিজনবাসিনীকে প্রণাম করলে, দেবব্রত বল্লে "ওকি, বিজন আমার স্ত্রী তোমার—আপনার চেয়ে ঢের ছোট —ওকে আর প্রণাম করবেন না।" কিন্তু অলকা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হল। যা হোক অলকাকে কিছু খাইয়ে একখানা ঘরে শুতে দেওয়া হল। অলকার মনে হল দেবব্রত যেন ভারি বিপদে পড়েছে, অথচ যেন কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু সে চোখের চাহনি দেখে মনে হয় যে সে ছাড়া অলকার কেউ নেই ; ও যে বড় আপনার, বড় প্রিয়। যেন মনে হয় ঐ মুখ খানা বুকের ভিতর আঁকা আছে। কিন্তু কবে দেখেছি কোথায় দেখেছি ঠিক যেন মনে পড়েনা। না, এখান থেকে কিছুতে যাওয়া হবে না। কিন্তু ঐ বিজনবাসিনী যেন অলকাকে দেখে বড় দুঃখিত। এটুকু সকলেই বুঝতে পারে কিন্তু উপায় নাই। অলকা সব তুচ্ছ

ক'রে শুধু দেবব্রতকে দেখে আর তন্ময় হয়ে যায়। ক্রমে অলকা বুঝলে সে যদি প্রহারও খায় তবু এ স্থান ত্যাগ করবে না। জীবনে দেখাতে এত সুখ কই এতদিন ত সে কখনও বুঝতে পারেনি। সে পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ করে শুধু দেবব্রতকেই দেখে। বিজনবাসিনী এটুকু লক্ষ্য করে আর ভাবে, এই হতভাগীই যে আমার স্বামীকে গুণ করেছে তার আর সন্দেহ নাই। এখন উপায় কি!

তাদের কলকাতা যাবার দিন স্থির হল বিজনবাসিনী কিন্তু বেঁকে বসল। স্বামীকে বল্লে "দেখ তোমার ঐ অলকাকে—এই ভুলেগেছি দিদিকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়া হবে না। আমায় যা' তা ব'লে বুঝিয়ে দিলে, কিন্তু আর কেউ তোমার এ কথায় বিশ্বাস করবে? কখনও না। বাবা, মা আরও পাঁচ জনকে আমি কি বলব!"

"কেন যা সত্যি, তাই বলবে।"

"সে আমি বলতে পারব না। আমি সব জানি। ওকে? আগে থেকে ভাব-সাব ছিল, এখন তুল্লে ঘরে এনে।"

"ছিঃ ছিঃ বিজন ওকথা বলো না, বেশ তবে এখন দেশে চল, সেখানে একদিন দুদিন থেকে তারপর অলকাকে কোন আশ্রমে রেখে দেব।"

দেবব্রতর সত্যই ভাবনা হল, তাইত সে কি সত্যই পাগল হয়েছে না না। কখনই না! মন সর্ব্বদা সত্যি কথা কয়। আর সেই ঝি এর প্রত্যেকটীকথা মিলে গেল। না, এ আমার অলকা—অলকা না হ'লে কখনও আমার কাছে নিশ্চিন্ত হ'য়ে একবস্ত্রে চলে আসে। না, না, অলকাকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। আমি অলকাকে যে একদিন না দেখে থাকতে পারি না। তবে বিজন যা বলছে সেটাও ঠিক,

আর ত কেউ বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস যোগ্যও নয়। এখন উপায় কি বিজনবাসিনীকে আশ্বাস দিয়া দেবব্রত বললে—"বেশ দেশেই যাওয়া যাচ্ছে। বলা যাবে কাশী থেকে এই স্ত্রীলোকটী সঙ্গে এসেছে দু'দিন এখানে থেকে কলকাতায় আশ্রমে যাবে।" বিজনবাসিনী রাজী হল। অলকাকে নিয়ে সবাই দেশের বাড়ীতে গিয়ে উঠল।

অলকা দেশের বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝলে যে রোজ সে যে সব কল্পনা করত মনোরাজ্যে নয়তো স্বপ্নরাজ্যে এই গৃহের প্রত্যেকটীর সঙ্গে সে সব মিলে যাচ্ছে। এই ঘর দোর আসবাব পত্তর একদিন সব তার ছিল। আজ নেই, কিন্তু একদিন যেন এসব তারই ছিল। কেন এরকম মনে হচ্ছে তাই ত। একি স্বপ্ন দেখছি, না এই ত জেগে আছি। ওমা শোবার ঘরে ঢুকে অলকা সত্যই বসে পড়ল: "একি কার ছবি? এ যে বড় চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় একে দেখেছি।" ইতিমধ্যে দেবব্রত পেছনে এসে গদগদ কণ্ঠে বললে "অলকা অমন ক'রে মায়ের ছবির পানে কি দেখছ?"

অলকা কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বল্লে "কি জানি এই ছবির মাকে যেন কোথায় দেখেছি।" দেবব্রত পাগলের মত অলকাকে জড়িয়ে ধরবার জন্ত ছুটে এল; অলকা—অলকা—মা—মা—সত্যই তোমার মা; তুমি যে আমারই অলকা, আজ মা থাকলে তোমায় বরণ করে নিত। কিন্তু আমার কথা কেউ বুঝবে না, অলকা আর দূরে থেকো না। অলকা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে "তোমার কি কথা বিশ্বাস করবে না?"

"এই তুমি আমার প্রথমা স্ত্রী অলকা!" অলকা যেন কিছু বুঝতে পারলে না, শুধু মুখের পানে চেয়ে রইল। সে শুধু দেখতে চায় তার

দেবতাকে, দুটী নয়ন ভ'রে দিবানিশি দেখতে চায়। ওগো দয়াময়, ওগো বিশ্বনাথ শুধু চরণে স্থান দাও, কত আরাধনা করে যে তোমায় পেয়েছি, অভাগিনী আর ত কিছুই চায় না। শুধু তোমায় প্রাণ ভরে দেখবে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হ'য়ে শুধু তার প্রাণের দেবতাকে দেখতে চায়। কিন্তু অলকা দেবব্রতর কথা ঠিক বুঝলে না 'প্রথমা স্ত্রী' বললে কেন ? এর মানে কি ? এমন সময় সকল স্বপ্ন চুরমার করে বিজনবাসিনী ঝড়ের মত ঘরে ঢুকতেই দেবব্রত বেরিয়ে গেল কিন্তু অলকা শুধু তেমনি চেয়ে রইল। বিজনবাসিনী বল্লে "হ্যাঁ গা আমি না হয় কিছু বলছি না, কিন্তু কতদূর গড়ায় তাই দেখছি। পরপুরুষের মুখের দিকে অমন করে চেয়ে থাকতে তোমার লজ্জা করে না ? আমার স্বামী তোমার কে হয় সত্যি করে বল।"

অলকা হাত জোড় করে বল্লে দেবতা সাক্ষী করে বলছি উনি "আমার সব, যা বলবে তাই।" বিজনবাসিনী রাগে দুঃখে পাগলের মত ছুটে গিয়ে যেখানে দেবব্রত বসেছিল সেখানে আছাড় খেয়ে পড়ল।

"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এমন করে দগ্ধে মেরো না। তুমি কিনা শেষে বাড়ীতে এনে আমায় শাস্তি দিচ্ছ। কেন,আমি কি করেছি ?" দেবব্রত দেখলে "সর্ব্বনাশ," কাজটা মোটেই সুবিধার হচ্ছে না। বিজন-বাসিনীকে সান্তনা দিয়ে বল্লে "বিজন তুমি ওঠ, আমি আজই কলকাতা গিয়ে ব্যবস্থা করে আসছি।" "বেশ আজ এখনি তাই কর" বলে বিজনবাসিনী উঠে গেল। সেইদিনই দেবব্রত কলকাতায় গিয়ে একটি ছোট বাড়ী অলকার জন্য ব্যবস্থা করলে।

দেবব্রত রোজ গিয়ে একবার দেখে আসত এবং ক্রমে সে আগাগোড়া

সব কথা অলকাকে বললে। কিন্তু দেবব্রত যে বিজনবাসিনীর অনুমতি নিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অলকার কাছে আসে কথা বলে অলকার কাছে বসে, দেবব্রতর সবটুকুই যে বিজনবাসিনীর হাতে, একথা অলকা একদিন বুঝলে আর—আর—আরও বুঝলে যে তার কোন জোর বা অধিকার দেবব্রতর উপর নাই। দেবব্রত তাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু তবু দিনান্তে একবার না দেখলে যে বাঁচতে ইচ্ছা যায় না। যতক্ষণ দেবব্রত কাছে থাকে অলকার মনে হয় এই স্বর্গ, আর ত কিছু চাই না। কিন্তু কতটুকু সময় কাছে পাওয়া যায়। মনে হয় দিনের পর দিন এমনি ক'রে বসে থাকি, কথা বলি কিন্তু দেবব্রতর বেশীক্ষণ বসবার অবকাশ কোথায়? এদিকে দেবব্রত ভাবে বিজন যদি রাগ করে? সত্যি সে দুঃখ পায়। অলকা যে তার স্ত্রী একথা কে বিশ্বাস করবে? আর পাঁচজনেই বা বলবে কি? অলকা কিন্তু কিছু বুঝতে চায় না। দেবব্রতকে জোর করে ধরে রাখতে চায় কিন্তু দেবব্রত প্রায়ই বলে না, অলকা—এ—ঠিক—নয়-বিজন বড়ই রাগারাগি করে। অলকার ক্রমে মনে হতে লাগল দেবব্রত তাকে এড়াতে চায়, সে ক্রমে ভেঙে পড়ল, তবুও দেখবার লোভ ছাড়তে পারলে না। কিন্তু অলকা রাত দিন ভাবে দেবব্রত যদি অলকারই একমাত্র আপনজন, অলকা তার স্ত্রী, তবে কেন আর একজনের বিনা হুকুমে সে আসতে পারে না। কেন আর একজন তার সমস্ত অধিকার নিয়ে বসে আছে। আর—আর এখন যেন মনে হয় দেবব্রতই কি তাকে ছাড়তে পারলে বাঁচে না? হয়তো মুখে কিছু বলতে পারে না, মনটা কোমল, দয়ার শরীর। ক্রমে অলকা নানা কথা মনে মনে তোলপাড় করে ভাবে নাঃ দেবব্রত তাকে হয়ত একটু ভালবাসে নইলে বাড়ী ঝি চাকর বামুন, ইত্যাদি করে

তার জন্য এত খরচ করবে কেন? কিন্তু সবটুকু কি প্রাণ থেকে করে?

একদিন অলকার অনুমান সত্যি হল। সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে অলকার খুব জ্বর, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অলকার মনে হল আজ সে বড় একা বড় অসহায় এই সময় যদি তার দেবতা দেবব্রত এসে একবার দাঁড়ায়! মনে হয় যেন একবার তার বুকে মাথাটা রেখে সকল সাধ মিটিয়ে নিই। সত্যিই দেবব্রত এল কিন্তু বসল না, বললে, "নাঃ বিজনবাসিনী তাঁর জন্যে জেগে বসে আছেন, এই ঝড় জলে তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে আমি আসি কিন্তু তুমি কেমন আছ না এসে থাকতে পারলাম না, ছেলেরাও জেগে বসে থাকবে। আর অমন করে আমায় চিঠি লিখোনা অলকা, হয়ত বিজনবাসিনীর চোখে পড়লে সে একদিন আত্মহত্যা করে বসবে। আমি তোমার জন্য কি অশান্তি ভোগ করছি অলকা তুমি বুঝতে চাওনা যাকআমি তবে এখন চল্লাম, ডাক্তার কি বলে, চাকরকে পাঠিয়ে খবর দিও।" দেবব্রত চলে গেলো।

আকাশে ঘনঘটা করে বাদল নামল। উঃ সে কি গর্জ্জন। বুঝি প্রলয় এসে সৃষ্টি নাশ করে দেবে। আজ অলকা সত্যই বড় একা, "ওগো বিশ্বেশ্বর - মানুষ বিশ্বনাথ চেয়েছিলাম বলে কি এতই শাস্তি দিতে হয়? কেন? কেন? প্রভু কেন এ সুখের মুখ আমায় দেখালে? আমি ত চির অভাগিনী—কেন তবে! অলকা আর ভাবতে পারলে না। অলকার জন্য দেবব্রতর অশান্তি—উঃ—আর না—এক মুহূর্ত্ত এখানে নয় সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল—ঘুর্ণিবেগে সমস্ত জগত অমূলক ছায়ার মত তার চোখের সামনে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে লাগল। নাঃ আর নাঃ সত্যি তাঁর

সব আছে, পতিপ্রাণা স্ত্রী ঘর সংসার সমাজ, সুখ, যাবতীয় সব। আমি কে? ওসব দেবব্রতর মিছে কথা—স্ত্রী না ছাই আমি কি এতদিন অন্ধ হয়েছিলাম? হ্যাঁ অন্ধ, কে আমায় এমন অন্ধ করলে? সে কে? উঃ কেন দেখলাম, কেন দেখতে চাইলুম, বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে। না না আজ অকূলের পথে পাড়ি দেব। এতদিন নিজের অমর্য্যাদা করে শুধু সামান্য একজন রক্ষিতার মত পড়েছিলাম এবার দেখব কেউ—বিশ্বনাথ সত্যি আছ কিনা, অভাগিনীর কেউ আছে কিনা না, না, পৃথিবীতে আর তার কেউ নেই। সবভুল সব ভুল, সব মিথ্যা, সব কল্পনা, সবমনগড়া। কেন সে এতদিন আলেয়ার পেছনে ছুটেছিল?

অলকা পাগলের মত ঝড় জল মাথায় ক'রে পথে বেরিয়ে পড়ল। সে ছুটল আজ অসীমের পথে—দেখতে সত্যি কেউ তার আছে কিনা। আজকে সে ঝড়কে সাথী ক'রে ছুটেছে, কিন্তু তবুও বিদ্যুতের মাঝে কার মুখ বারে বারে তাকে ফিরে যেতে আহ্বান করে, না, না, সে বুঝেছে দেবব্রত শুধু ক্ষণেকের মোহে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এখন ভুল ভেঙেছে; উঃ কিন্তু অলকার ভুলের শেষ কোথায় গিয়ে হবে—?

পরদিন প্রভাতে—

ঝড় জল থেমে গেছে বৃষ্টি ধোয়া আকাশে সূর্য্যের আলো চারিদিক ঝলমল করছে—কিন্তু তবুও যেন এই বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের অতল—তলে কি এক রহস্যময় অন্ধকার—

গঙ্গার ঘাটে লোকে লোকারণ্য জনসাধারণ তাদের কৌতূহল দৃষ্টি মেলে দেখছে—

এক অনিন্দ্যসুন্দর তরুণীর দেহ গঙ্গার তীরে এসে ঠেকেছে—পুষ্পের সকল সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতাকে ম্লান করে আজ বিশ্বনাথের চরণে এই অনাঘ্রাতা কুসুম কে উৎসর্গ করেছে।

হঠাৎ এক সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী ভীড় ঠেলে এসে সেই তরুণীর দেহখানি সযত্নে তুলে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে সেস্থান পরিত্যাগ করলেন।

সেদিন আগত সন্ধ্যারাণীর বেশটা বড়ই মধুর লাগ ছিল। চট্টগ্রামে সন্ন্যাসীর গৃহের দাওয়ার উপর অলকা বসে ঠাকুরের জন্য সদ্য তোলাফুলে মালা গাঁথছে, কাছেই একটা অশোক গাছ, তারই পাশে অনেকগুলি শিমুল গাছ পাশাপাশি চারিদিকে যেন লালে—লাল পশ্চিম আকাশেও যেন ঐ অশোক শিমুলের রং—। অলকা ভাবে তার জীবনটা যেন নিছক স্বপ্নে ভরা—এ আবার সে কোথায় এসে পড়ল কিন্তু সে কিছুদিন থেকেই বুঝলে—এই তার একমাত্র আশ্রয় এখানেই তার আপনজনের সাক্ষাৎ মিলবে। বৃদ্ধ সন্নাসী অলকাকে মন্দিরের কাজেই নিযুক্ত করেছেন।

অলকা সন্নাসীর প্রত্যেক কথাটি প্রাণ থেকে অনুভব করতে লাগল— সন্ন্যাসী বার বার অলকাকে স্মরণ—করিয়ে দেন—যে মা সুখ-দুঃখ আসে আমাদের আরব্ধ—কর্ম্ম থেকে। দেবব্রতর মোহ তোকে যুগ-যুগান্তর এমনি সংস্কারের মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কর্ম্মেতেই আমাদের বারে বারে ঘুরে ফিরে এই পৃথিবীর বুকে টেনে আনে। এবার তোর বাসনা কামনা পাপ-পুণ্য সব বিশ্বনাথের চরণে ফেলে দে, তোর সকল ব্যাথার অবসান হক।

মাঝের কালস্রোত কতদিন ধরে বয়ে যাচ্ছিল। সহসা চট্টগ্রামের এক ক্ষুদ্রপল্লী-পথে এক পথিককে দেখা গেল, তার মাথার কেশ গুলি—শ্বেতবর্ণ বার্দ্ধক্য তার সবই হরণ করতে বসেছে, জরা তার সারা দেহে প্রভাব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তবু সে চলেছে—অলকার কাছে তাকে যে যেতেই হবে, সংসার থেকে তার ছুটি মিলেছে—হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়ে—কিছু পরেই আকুল ধারায় বৃষ্টি নামল—উঃ কার অভিশপ্ত জীবনের চোখের জল এ—পথিক আর যে পারেনা, ঐ বিদ্যুতের মাঝে ও কার মুখ—ঐ অশনিপাতের সঙ্গে কার ও আর্ত্তস্বর তাকে এমন করে বিচলিত করছে। কাছেই এক ভাঙ্গা শিব মন্দিরে দেবব্রত আশ্রয় নিলে শুনতে পেলে—মন্দিরের মধ্যে তখন—কে পাঠ করছে—

সংসরাগ্নৌ ময়াহো বিপচন মণিশং বেস্ত মানেন ঘোরে, জন্মা পায়ান্ধকারে মহতি বিপরিবর্ত্তং ময়াপ্তেন দিষ্ট্যা। প্রাপ্তা ক্ষেমা মহাক্লেশ তিমির হরনা যোগদীপস্য দীপ্তি লব্ধালোকঃ পতেয়ং। নবিষয় মৃগ তৃষ্ণা দৃশা বঞ্চিতোহহংম্ ॥

শ্লোকের অর্থ

অহো! আমি ঘোর সংসারাগ্নির মধ্যে বিপচনন (ভাজা পোড়া) অনুভব করিতে—করিতে এবং মহান জন্ম মরণান্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সৌভাগ্য বশে ক্ষেমা (কল্যাণকারী) মহাক্লেশ—তিমির হরণা যোগদীপের দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাদৃশ লব্ধালোক আমি বিষয় মৃগাতৃষ্ণার—মোহে বঞ্চিত হইয়া পুনশ্চ তাহাতে পতিত হইব না।

(শ্রীমৎস্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য)

মায়ের দান

১

"মা আনন্দময়ী, এই আনন্দের দিনে আমায় কেন নিরানন্দ করেছ মা! তোমার ঐ চিণ্ময়ী ভুবনমোহিনী দশভুজা মূর্ত্তি দেখবার জন্য আমার প্রাণ যে বড় ব্যাকুল হয়েছে, মা! প্রতি বছরের মত এবার কি তোমায় দেখতে পাব না?"

সেবা আজ সত্যি করেই বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, হয়ত এ বছর তার পূজা দেখা কপালে নেই, সেবার অন্তরের কাতর প্রার্থনা নিবিড় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কণ্ঠে ব্যক্ত হয়ে পড়ল, সে উচ্ছ্বসিত আবেগে আর চোখের জল রোধ করতে পারলে না। ঠিক সেই সময় একটী সুদর্শন যুবক সেই ঘরে প্রবেশ করলে, সে সেবার স্বামী সৌরেন। সেবাকে এভাবে এমন সময় কাঁদতে দেখে সে ভারী আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হয়ে বললেঃ—

"একি সেবা তুমি কাঁদছ? কেন, কাঁদছ শীঘ্র বল! কি হয়েছে তোমার! কেউ কি কিছু বলেছে?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর এল—"না"।

"তবে কি আমার উপর রাগ করেছ ? না তোমার মায়ের জন্য মন কেমন করছে ? বল, সেবা, চুপ করে থেকো না !"

"না আমি বলব না, সে তুমি বুঝবে না, মিছে আমার উপর রাগ করে দুঃখ টেনে আনবে !"

"তোমার জন্য দুঃখ একবার ছেড়ে একশবার করতে প্রস্তুত আছি যদি তাতে তুমি সুখী হও। আর রাগ ? কখনও কি রাগ করেছি তোমার উপর ? বল ; আমি কোথায় ছুটে আসছি, যে কদিন পূজার ছুটি পেয়েছি, তুমি কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবে তাই জানতে। আর তুমি কি না কাঁদছ ! ছিঃ আমার ভারী বিশ্রী লাগছে সেবা, আমার মনে হচ্ছে, তোমার মায়ের জন্য মন কেমন করছে, না ?"

স্বামীর আকুলতা দেখে সেবা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, সে বললে, "না আমি আমার মানবী মায়ের জন্য কাঁদছি না, আমি কাঁদছি কেন জান ? ঐ দেখ আজ সকলে পূজো দেখতে—মাকে দর্শন করতে—চলেছে, আর আমি ঘরে বসে আছি ! তুমিত জান প্রতি বছর আমি এমন সময় আমার মায়ের সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে 'মায়ের' পূজা দেখে বেড়াতাম কিন্তু আজ আমায় কে নিয়ে যাবে ?"

এইবার সৌরেনের মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়ল বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, "এখন বুঝতে পারছি সেবা আমি বড় স্বার্থপর, নিজের সুখের জন্য তোমার জীবন দুঃখময় করে তুলেছি, তোমার মত এমন হিন্দু-কন্যাকে, এমন দেব-দেবী ভক্ত, হিন্দু-আচার-নিষ্ঠা-সম্পন্ন মেয়েকে খৃষ্টান হয়ে বিয়ে করাটা শুধু ভুল নয়, ভারী অন্যায় ! কিন্তু সেবা তোমায় দেখে, তোমায় ভালবেসে আমি সব ভুলেছি, ধর্ম্ম, সমাজ, আত্মীয়, স্বজন।

কিন্তু আজ আমার সেই দুর্ব্বলতাটুকুই আমার মনে তীব্র আত্মগ্লানি এনে দিচ্ছে। সেবা কিছু মনে করো না, তুমিও ত কিছু ছেলেমানুষ ছিলে না—তবে এ বিবাহে মত দিলে কেন! সতের বছরের মেয়ের এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে যাকে তুমি বিয়ে করছ সে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী! শুধু তাই নয় আমার বৃদ্ধ বাপ মা বর্ত্তমান। নিজের ধর্ম্মে সকলেরই নিষ্ঠা আছে। তাঁরা তোমার এই মনের ভাব দেখলে ভারী দুঃখিত হবেন, জেনে শুনে কেন সেবা শুধু ক্ষণিক মোহে, ভালবাসার খাতিরে আমায় বিয়ে করলে! আমি এখন বেশ বুঝেছি আমার চেয়ে তুমি তোমার ঐ মাটীর ঠাকুরকেই বেশী ভালবাস।"

সেবার চোখের জল আর বাধা মানলে না, শ্রাবণের ধারার মত অজস্রধারে বয়ে যেতে লাগল, একটু সংযত হয়ে সে বললে,

"হ্যা, ভুল হয়ত করেছি, ভালবাসায় মানুষকে অন্ধ করে দেয়, বোধহয় কোন বিচারশক্তি থাকে না কিন্তু আমার ঐ মাটির ঠাকুরই আমায় সব দিয়েছেন, তোমাকেও পেয়েছি তাঁরই কৃপায়, আর মাটির ঠাকুরকেই আমি জগতে সব চেয়ে আপনার মনে করি। যখন অসহায় পিতৃমাতৃহীনা শিশু নিঃসঙ্গ একাকী পড়েছিলাম, কে আমায় মায়ের কোলে এনে দিলে আবার তুমি এলে প্রেমময়রূপে চরণে আশ্রয় দিতে! সবইত মায়ের দান, কেন তুমি মুখ ভার করেছ, যে যাকে ভালবাসে,সে সকলকেই ভালবাসে! আমি তোমায় খুব ভালবাসি!"

সৌরেন অধীর হয়ে বললে,—"ওঃ—সকলের ভেতর আমিও একজন, বলতে বলতে সে পাশে শোবার ঘরে গিয়ে জানালার কাছে উদাস দৃষ্টি

মেলে চেয়ে রইল, কিন্তু শুনতে পেলে পাশের ঘরে সেবা স্তব পাঠ করছে:—

"ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু ন দাতা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমেব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ভবাব্ধিপারে মহাদুঃখ ভীরো
প্রপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ
সংসারপাশ প্রবদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং-গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥"

২

সৌরেন কখন অন্যমনস্ক হয়ে তার আলমারী খুলে একখানা ছোট খাতা বার করে পড়তে বসে, এই খাতাখানি তার পূজনীয়া শাশুড়ী-ঠাকরুণ তাকে পড়তে দিয়েছিলেন, তিনি আজ এক বৎসর হতে চলল মারা গেছেন! সৌরেন যখন সেবাকে বিবাহ করবার জন্য তাঁর কাছে আকুল মিনতি জানায়, তখন তিনি এই খাতাখানি সৌরেনের হাতে দিয়ে বলেন, "দেখ বাবা সেবা আমার পালিতা কন্যা, সেবাকে কি করে পেয়েছি, তা এই খাতাখানিতে সবিশেষ পাবে"। সব জেনেও যদি তুমি সেবাকে গ্রহণ কর, তার চেয়ে আমার আর কি আনন্দ থাকতে পারে, তোমাদের আনন্দেই আমার আনন্দ, আমার মনে হয় সেবারও এতে অমত নেই, তবে তাকে আমি এমনভাবে মানুষ করেছি যে সে জগতের কিছুই বোঝে না, সে সত্যই ভগবানের চরণে নিবেদিতা একটী ফুল। কিন্তু আমারও মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, যোগ্যপাত্রে ওকে অর্পণ না করে যেতে পারলে শান্তি কোথায়! যদি সত্যই তোমার সেবাকে বিবাহ করবার মত হয়, তবে ওকে তুমি তোমার মনের মত করে গড়ে তুলো, জগতে একমাত্র স্নেহ ভালবাসাই মানুষের জীবনে মহা পরিবর্ত্তন এনে দেয়।"

খাতাখানিতে লেখা ছিল :—

সে বছর ৺পূজার ছুটীর বন্ধে কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে, অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত হল হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সিমলা

পাহাড়ে যাওয়া যাক, ছেলেপুলের ঝঞ্ঝাট নেই, স্বামী স্ত্রী দু'জন, আর পুরান চাকর মধু। আমরা দুজনেই বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে পড়েছি অথচ এ পর্য্যন্ত পাহাড় দেখবার সুযোগ হয়ে উঠেনি। যাহোক তারপর দিন রাত নয়টায়, পাঞ্জাব মেলে সিমলা অভিমুখে রওনা হ'য়ে তৃতীয় দিবসে অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা কালকা ষ্টেশনে পৌছালাম।

কালকা থেকে সিমলা প্রায় ছয় ঘণ্টার পথ, অনেক পাহাড় বন জঙ্গল পেরিয়ে ছোট ছোট কতকগুলি ষ্টেশন ও সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে সিমলা ষ্টেশনে এসে পৌছালাম তখন বেলা এক-টা।

আমার স্বামীর বন্ধু সমীরবাবুর স্নেহে যত্নে আমাদের এই শীতপ্রধান অপরিচিত স্থানেও কিছুরই অভাব অসুবিধা রইল না, লকড় বাজার নামক একটী পাহাড়ের গায়ে একখানি বাড়ীতে আমরা এক মাসের জন্ম রইলাম. বাড়ীর নাম "Samton Villa" ভারী সুন্দর জায়গায় এই বাড়ীখানা। সমস্ত পাহাড়টা এখান থেকে সব দেখা যায়, জানালার ধারে দাঁড়ালে পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভা চোখে পড়ে। সিমলায় খুবই ভাল লাগল, কিন্তু ভয়ানক হাড়ভাঙ্গা শীতে যেন জড়ভরত হয়ে পড়লাম। মধু চাকর কোন কাজে হাত পা পায়না কাজেই একটী পাহাড়ী আয়া রাখতে হ'ল।

সেদিন বৈকালে "Mall Road" ঘুরে বাড়ী ফিরচি, পথে চোখে পড়ল ইংরাজদের ছোট ছোট শিশুদের উপর, তারা সব তাদের পাহাড়ী আয়ার সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছে। কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে! চোখ ফেরাতে ইচ্ছা যায় না! তারা রং-বেরংএর জামা কাপড় প'রে লঘু চঞ্চল পদে রঙ্গীন প্রজাপতির মতই যেন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। মন

হল একবার ছুটে গিয়ে তাদের বুকে তুলে নি—অনিমেষ নয়নে শুধু চেয়ে রইলাম,—নাঃ পরের ছেলে যদি কিছু মনে করে কিম্বা বাধা দেয়! ছিঃ অপমানের সীমা থাকবে না যে। হায় রে বন্ধ্যা নারীর বুকে এই বার্দ্ধক্যের সীমায় এসেও অতৃপ্ত বুভুক্ষ হৃদয়ের অসীম মাতৃত্ব যেন হাহাকার করে উঠল! পাশেই স্বামী ছিলেন হয়ত আমার মনোভাব বুঝলেন, কে জানে! আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কি ভাবছ?"

"কিছু ভাবিনি, এই সুন্দর ছেলে মেয়েগুলোকে দেখছি।" "ও আর দেখে কি হবে? চল কাছেই কালী-বাড়ী, মাকে দর্শন করে যাওয়া যাক্"

"বেশ চল! সত্যি মাকে ত দেখা হয়নি,......আরত মোটে দুটোদিন আছি! হয়ত আর সময় হবে না, ভাগ্যিস তুমি বললে।"

Mall Road ছাড়িয়ে অনতিদূরে কালী-মন্দির! ক্রমে কালী-বাড়ীর কাছে এসে পড়লাম, মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কালো কালো পাহাড়ের বুকে সন্ধ্যার আঁধার আরও নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ীগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠে যেন কালী পূজার দেওয়ালীর সৃষ্টি করলে! সেই আলো-আঁধারে মাঝে যেন সেই শিশুদের মুখগুলি উকিঝুঁকি মারছে নিজের অজ্ঞাতেই আমার দীর্ঘশ্বাস সহ অস্ফুট কণ্ঠে "মাগো" বলেই থেমে গেলাম। ছিঃ ছিঃ মাকে দর্শন করতে এসে এ আমি কার চিন্তা করছি, কেন এ ব্যথা বুকে জেগে উঠে? মাগো, যদি মা ডাকে বঞ্চিত করেছ তবে এ অতৃপ্ত কামনাটুকু মুছে দাও মা আর কেন এ দুরাশা।

স্বামী ডাকলেন, "এস, মন্দিরের ভেতরে এইবার মায়ের আরতি হবে।

মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলাম, সম্মুখে মা দাঁড়িয়ে গভীর অন্ধকারের বুক চিরে ঐ যে মায়ের রূপ ফুটে উঠেছে, ঐ একটুখানি রূপের ঝলকে এই বিচিত্রা, রহস্যময়ী ধরনী যেন আলোয় আলো হয়ে গেল। আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে অভিভূত হ'য়ে শুধু চেয়ে রইলাম। পুরোহিত আমায় সচকিত করে বললেন, মা তোমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হ'ক ;— এই নাও মায়ের প্রসাদ। প্রসাদ গ্রহণ করে আরতিশেষে রাতে ঘরে ফিরছি, দূরে এক প্রবাসী বাঙ্গালী বেঞ্চে বসে গান গাইছিলেন।

"সকলই তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার ইচ্ছা তুমি কর, মা লোকে বলে করি আমি ॥"

পরদিন প্রভাতে যখন সূর্যাদেব এই শান্ত শীতল পাহাড়টীর উপর তাঁর কনক-কিরণ-আভায় চারিদিক উদ্ভাসিত ক'রে উদয় হলেন, তখন আমাদের বাগানের শিশির-ভেজা ফুলের গাছ থেকে টপ টপ করে যেন কার অশ্রু ঝরে পড়ছিল ঐ সবুজ ঘাসের উপর। তখন সবে মাত্র দু' চারটী পাহাড়ী রমণী তাদের ফল ফুল সবজীর ঝুড়ি নিয়ে চলেছে হাটে। আঁকাবাঁকা পথগুলি ঐ সুন্দরী রমণীরা যেন আলো করে চলেছে, গত কালের মত আজও সেই একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কিন্তু আমার ক'দিনের এই জীবন-যাত্রা বড় সুখেই যেন কাটল! হয়ত জীবনে আর এ শোভা দেখা হবে না, প্রাণ ভরে ঐ পাহাড়টী মনে এঁকে নিই। যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল পাহাড়ের খানিকটা যেন লাল হয়ে গেছে, নিরীক্ষণ করে দেখলাম, না এ যে আম গাছের মত প্রকাণ্ড বৃক্ষের সারি, আর সেই গাছে কি অসংখ্য

লাল ফুলে ভরে গেছে। এমন ফুল ত কখনও দেখিনি! তাড়াতাড়ি আয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আয়া, ঐগুলি কি ফুল?"

"মাইজী, এই ফুলের নাম 'বরাস' ফুল!

"কই আজ একমাস এসেছি একদিনওত চোখে পড়েনি, আমিত প্রায়ই এখানে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখি।"

আয়া হেসে বললে, "তা দেখবেন কেমন করে! যত শীতও পড়বে, আর এই ফুলও তত ফুটবে, নইলে এতদিন দেখতে পেতেন। বোধ হয় মাত্র দু চারদিন হ'ল ফুটেছে, আর এ ফুল বেশীদিন থাকেও না, দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু গন্ধ নেই, এতে কত ওষুধ তৈরী হয়।"

আমি নির্ণিমেষ নয়নে তবু চেয়ে ফুলের শোভা দেখতে লাগলাম। ঐ বরাস ফুলগুলি কাছে গিয়ে দেখবার কি জানি এক অদম্য কৌতূহল হ'ল, আয়া আমার মনের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, "যাবেন মাইজি ঐ পাহাড়ে? এখান থেকে যত দূর দেখাচ্ছে তত দূর নয়, এই দশমিনিটের পথ হবে আর এ পাহাড়ের নীচেই খানিকটা সমতল জমি আছে। সেখানে কি সুন্দর বাগান ও একটী সাধুর কুটীর আছে, ঐ জায়গাটীর নাম—ফকিরের মাঠ।"

"সাধু আছেন নাকি?"

"এখন যে একজন সাধু আছেন, আমরা জন্মে অবধি তাঁকে দেখছি, তিনি বড় ভাল!"

"তবে চল সাধুদর্শন করে আসি, 'ফকিরের মাঠ' ঘুরে এসে তবে চা খাব।"

আমার স্বামীও সানন্দে আমাদের সঙ্গে চললেন। আয়ার কথা মিথ্যা নয়। অনতিবিলম্বে আমরা সেই ফকিরের মাঠে এসে পড়লাম, এই জায়গাটাতে আমায় কে যেন কি এক বিপুল আকর্ষণে টেনে এনেছে। এমন সুন্দর স্থান বুঝি কখনও দেখিনি, সমতল ভূমির চারিদিকে প্রাচীরের মত পাহাড়, তারই গায়ে বরাস ফুলের গুচ্ছ, ফুলে ফুলে ঘেরা এই বাগানের মাঝে একখানি ছোট কুটীর, কুটীরের আশেপাশেও নানা জাতীয় ফল ফুলের গাছ, নন্দন কানন কেমন তা জানিনা, কিন্তু মনে হল এর চেয়ে নির্জ্জন নিভৃত সৌন্দর্য্যের আকর বুঝি কল্পনায় আনা যায় না। এমন জায়গায় সত্যই সাধনা করতে হয়।

কুটীরের কাছে এগিয়ে যেতে কেমন একটা সঙ্কোচ হল! খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ভাবছি—কি বলে সাধুকে ডাকব, এমন সময় কে বললে, "এই মায়ি ভিতর আও।" চেয়ে দেখি এক অশীতিপর বৃদ্ধ, পরণে তাঁর গৈরিক বসন, সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, দর্শনে আপনা হতেই শ্রদ্ধা আসে। সাধুকে প্রণামান্তে কুটীরের অভ্যন্তরে গিয়ে উপবেশন করতে যাচ্ছি, এমন সময় নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম কি! এক তিন বৎসরের শিশু সাধুর কম্বলের উপরে বসে খেলা করছে, ঠিক যেন স্বর্গের দেবশিশু, শিশুটার রূপের যে তুলনা হয় না। হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন ঐ সমস্ত বরাস ফুলের সৌন্দর্য্য একত্রীভূত হয়ে এই শিশুর দেহে ছড়িয়ে পড়েছে, কার বাছা এ? শিশুটী এইবার আমাকে দেখে সাধুর কাছে যাবার জন্য ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদবার উপক্রম করলে। সাধু তাকে কাছে না নিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ঐ তোর মা এসেছে যা।" বালিকাটি শুধু আমার মুখপানে খানিকক্ষণ চেয়ে কি মনে করে এগিয়ে এল। আমি

আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারলাম না, ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিলাম। সাধুকে আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, "এর মা কোথায়?" সাধু হেসে বললেন, "এর মা তুমি, তোমার জন্যই এ জন্মেছে।" আমি কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লাম, এ কি রহস্য? এ সাধু কে? সাধু আমায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে বললেন, শোন, "এ মেয়ের মা ঠিক এমুনি ছোটবেলা থেকে আমার কাছে আসত, তার বাপ ছিল এক ধনী পাহাড়ী সওদাগর, এর মায়ের নাম ছিল "ফুলমু" ফুলমু ক্রমে বড় হল, অনেক বড় ঘরে তার বিবাহের সম্বন্ধ এল কিন্তু কিছুতে সে বিয়ে করতে রাজী হ'ল না। একদিন আমার কাছে সে তার মনের গোপন কাহিনী জানালে। বললে, সে এক গরীব পাহাড়ী যুবাকে ভালবাসে, আর তারই সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে। ফুলমু আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। আমি স্নেহান্ধ হয়ে গোপনে এদের বিবাহ দিয়েছিলাম, তারপর দুবৎসর পরে এই মেয়েটী হয়। তাদের দেখে বড় আনন্দ হত, তারা প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। যদিও তারা বড় দুঃস্থ গরিব ছিল, তবু তাদের অমন পবিত্র প্রেম একদিনের জন্যও তাদের মুখের হাসিকে ম্লান করতে পারেনি। কিন্তু জাগতিক সুখ বড় ক্ষণস্থায়ী, মা! প্রতিদিন যারা এই দুঃখময় পৃথিবীতে স্বর্গসুখ অনুভব করত, কঠিন নিয়তি এসে একদিন তাদের সব ভেঙ্গে দিলে। যুবকটি অর্থাৎ এই শিশুকন্যার পিতা হঠাৎ মুখে রক্ত উঠে মারা গেল! আহা সে স্ত্রী কন্যাকে সুখে রাখবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করত কিন্তু অনেক দিন পেটভরে সে খেতে পেত না। সে চলে গেল, রেখে গেল, অসহায়া পত্নী ও কন্যাকে পথে বসিয়ে। সে ভেবেছিল আমি মরে গেলে, কি ফুলমুর বাপ মা তাকে ফেলতে পারবে?

কিন্তু ফুলমুর পিতা ঠিক দক্ষরাজের মতই ফুলমুর মুখদর্শন করলেন না। ফুলমু চারিদিক আঁধার দেখলে, অগত্যা বাধ্য হয়ে সে এক সাহেব বাড়ীতে আয়ার কাজ নিলে। মেয়েকে সারাদিন আমার কাছে রেখে সে কাজ করত, সন্ধ্যা হলে, লছমীকে নিয়ে যেও। আজ তিন দিন হল লছমীকে সে আর নিতে আসেনি! দুদিনের জ্বরে তার ইংরাজ মনিব তাকে হাঁসপাতালে দেয়। আজ তার সব শেষ হয়ে গেছে! কাল সন্ধ্যায় লছমীকে নিয়ে ফুলমুকে দেখতে গেলাম, ক্ষীণকণ্ঠে সে এইক'টা কথা বলেছিলো, "বাবা, আমার লছমী...রইল, তাকে যে ভালবাসবে, তার হাতে লছমীকে দিও। সে আর কিছু বলতে পারেনি।" আবার বলতে লাগলেন—

"লছমীকে বুকে করে ভগবানকে করজোড়ে জানালাম প্রভু এ কি পরীক্ষা? সর্ব্বত্যাগী হয়ে আবার এই শিশুর তত্বাবধান করতে হবে, তাকে মানুষ করতে হবে! তবুও ভগবানের দান মাথায় পেতে নিলাম, মনে জানি তিনিই আমায় মুক্তি দেবেন। এইত মা তুই এসেছিস্, নিয়ে যা একে, তাঁর সেবা করছিস ভেবে মানুষ করিস্ আর এর মায়ের শেষ-ইচ্ছা স্মরণে রাখিস। এর নাম রইল—'সেবা'। যা মা তাঁর দান মাথায় করে ঘরে যা, আমারও পূজার্চ্চনার সময় আগত।"

আমার স্বামী একটু ইতস্ততঃ করলেন, বললেন, "তাইত বাবাজী পাহাড়ীরা শুনেছি ভয়ানক হিংস্র হয়, আবার কিছু গোলযোগ হবে না তো?"

তিনি অভয় দিয়ে বললেন, "কোন ভয় নেই বাড়ী যাও। তাঁকে ভূলুন্ঠিত হয়ে প্রণাম করে ঘরে চললাম। আমি অমূল্য নিধি পেয়ে সেবাকে

বুক থেকে নামালাম না, অতৃপ্ত মাতৃস্নেহের হাহাকার জুড়িয়ে গেল।

চিরদিন সমান যায় না, আমার স্বামীও সেবাকে পেয়ে শেষ বয়সে বড় শান্তি পেয়েছিলেন কিন্তু একদিন তাঁর পরপারের ডাক এল, তিনি চলে যাবার একমিনিট পূর্ব্বে বলে গেলেন,' "সৌরেণের হাতে সেবাকে অর্পণ করো। আমি জানি সে সেবাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, আজ ক'বছর ধরে তাকে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু সে জানে সেবা আমার ঔরসজাত কন্যা, সে ভুল তার সবিশেষ জানিও। তার বাপ মার মত নিয়ে ভেবে চিন্তে যেন বিবাহ করে।"

সৌরেন এইবার প্রকৃতিস্থ হয়ে, ভাব্‌লে সত্য একদিন সে মনে করেছিল সেবা যাতে সুখী হবে সে তাই করবে, আজ পায়ে ধরে সে পিতা-মাতার অনুমতি নেবে। সত্যি ঠাকুর দেখতে গেলে এমন কি দোষ হবে? আমিত আর পূজা করব না, আহা! সেবা আজ বড় কাতর হয়ে পড়েছে! সৌরেন তৎক্ষণাৎ খাতা তুলে রেখে পিতা মাতার অনুমতি নিয়ে এল।

দশভূজা দর্শন করতে, যখন তারা মন্দিরে প্রবেশ করলে, তখন ভীড়ে ভীড়, সৌরেন ভীড় ঠেলে সেবাকে নিয়ে প্রতিমার কাছে এগিয়ে গেল।

বসন্ত-সমাগমে

মাঘ মাস, দুর্জ্জয় শীত, যে যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু এত রাতে ঐ মাঠের মাঝে নিরালায় বসে কে গান গায়? সেই পাগল নাকি? যে ভাবুক কল্পনাপ্রিয় যুবকটির কেউ আপনার বলতে নেই, যেদিন কেউ দয়া করে কিছু তাকে খেতে দেয়, সে খায় পথে ঘাটে মাঠে, সে শুধু দিন নেই, রাত্রি নেই, গান গেয়ে বেড়ায়, তার করুণ গান শুনে কোন অচেনা পথিক তাকে দু'এক পয়সা দিয়েও যায় কিন্তু জগতের সুখ দুখের ধার সে ধারে না। তার হয়ত একদিন সব ছিল। কিন্তু মনে হয় সে যেন দিনের পর দিন রাতের পর রাত কার প্রতীক্ষায় বসে আছে, নিঝুম রাতে কুহেলিকাচ্ছন্ন মাঠে বসে দিগন্তের পানে চেয়ে কি গান গাচ্ছে? ওগো কবে এই ঠাণ্ডার ঘোর কেটে গিয়ে কোন শুভক্ষণে আবার বসন্তের মলয় বাতাসে আকাশ বাতাস ছেয়ে যাবে। এই শীতের হাওয়ায় বুকের রক্ত যেন জমে যায়! মনে হয় সারা জগৎটাই যেন এই শীতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

এমন সময় কে-এক পথ-চলা পথিক পাগলের অতি নিকটে এসে বসে পড়ে বলে, ঐ গানটা আর একবার গাও ত ভাই! আপন মনে

বলে উঠে! সত্যি কি আবার জীবনে বসন্ত আসবে? এই অমানিশির রাত্রি কি প্রভাত হবে? পাগল অচেনা পথিকের মুখ পানে বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকে, বলে তুমি আবার কে এলে? পথিক বলে, কেন অমন করে চেয়ে কি দেখছ, আজ থেকে এটি তোমার সাথী পাগল চমকে উঠে, আকুল হয়ে বলে উঠে, না, না, আমার সাথী আর কেউ নেই, কেউ হবেও না। সাথী? আমার সাথী—হ্যাঁ। একদিন সে এই জগতে ছিল, তাই এই জগৎকে এত ভালবাসি! পাগল আপন মনে বিড় বিড় করে বলে শোন! শোন! একটা গান গাই :—

মিছে কেন ভবঘোরে তুমি ঘুরে মর দিবানিশি,
এই যে ভবের বাজার
যাওয়া আসা কেবলি সার
এ ভবেতে কেউ নয় কার
মিছে ভালবাসাবাসি।

পাগলের করুণ গান আকাশ বাতাস ভরে উঠে, তার ব্যর্থ প্রাণের কাতর বেদনা যেন লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদে কোন নিরুদ্দেশে ভেসে যায়! পাগল উদাস চোখে ঐ মাঠে দিগন্তের পানে শুধু চেয়ে থাকে! পথিক বলে, "ভাই এইবার উঠ, বড় ঠাণ্ডা, হাত পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, দয়া করে আজকে রাতে তোমার ঘরে আমায় একটু আশ্রয় দাও, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার শরীর অবসন্ন এতক্ষণে পাগলের চমক ভাঙ্গে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলে, চল চল, ঘর আমার খুব কাছেই। ঐ যে দূরে ঐ বড়গাছটা, ওরই নীচে আমি বাসা বেঁধেছি।" দু'জনে

মাঠ পেরিয়ে আসে, আর বুঝি ভাবে! কতদিনে এই ঘোর তমসাবৃত রাত কাটবে?

খানিকটা এসে দুজনেই থমকে দাঁড়ায়! একি! এই মাঠের মাঝে কে শুয়ে? এ যে একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক! যতটুকু বোঝা যায়, সেই মেয়েটির সারা দেহে মাধুর্য্যের সীমা নেই,—এ তরুণী কে? এই বিজনে মাঠের ধারে অসহায়া পরিত্যক্তা পড়ে? কোন দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃতা, না স্বইচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে? যাহোক দুজনেই ঝুঁকে দেখে, অনুমান বুঝি মিথ্যা নয়! আত্মহত্যাই হয়ত করেছে কিন্তু নেড়েচেড়ে দেখে, প্রাণ এখনও দেহে অবস্থান করছে, দুজনেই আগ্রহসহকারে ধরাধরি করে সেই নারীকে গাছতলায় এনে শোয়ায়। মেয়েটির পরিচর্য্যায় সারা রাতই অনিদ্রায় অনাহারে কেটে যায়! উন্মুক্ত বৃক্ষতলে যখন প্রভাতের আলো এসে সকলের নিরাশ মনে আশার সঞ্চার করে দেয়! পথিকের হৃদয়ে সুদূর ভবিষ্যতে উজ্জল আশার রেখা ভেসে উঠে! মেয়েটির পানে নির্ণিমেষ নয়নে শুধু চেয়ে থাকে! ভাবে এই প্রভাতে-ঝরা শিউলীর মত মেয়েটী কাদের গো, তারা কেমন লোক, এই মেয়ের খোঁজে এখনও বেরোয়নি? নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে! মেয়েটী চোখ মেললে জিজ্ঞাসা করা যাবে! বেঁচে আছে তবে বড় দুর্ব্বল! আহা শীতে এই গাছতলায়! তাইত পথিক এতক্ষণে সযত্নে তার র‍্যাপারখানি তরুণীর হিম-শীতল অঙ্গে ঢেকে দেয়! যেন একটু ভয়ও হয় যদি এই অজানা তরুণী হঠাৎ চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে? কে এ তরুণী আমার রুদ্ধ অন্ধকার হৃদয়ে ক্ষীণ আশার দীপ জেলে দেয়?

মেয়েটির খোঁজ করতে হবে! পাগল নয়ত! কে জানে! এক পাগলের পাল্লাতে ত প ড়ছি।

হঠাৎ পাগল কোথা থেকে এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বলে, "অমন ইঁদুরের মত বসে থাকলে চলবে না। দুধটা ওকে খাইয়ে দাও, তবে ত উঠে বসবে! একখানা ঘর ঠিক করে এলুম! নেহাৎ যখন আমার কাছেই তোমরা থাকবে। ঘর যদিও ভারী বিশ্রী, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কুটুরী, তা হোক, স্ত্রীলোক নিয়ে কি গাছতলায় থাকা যায়! ছিঃ!"

দুধটুকু দুজনে মিলে মেয়েটিকে ধরে খাইয়ে দিলে, একটু পরেই মেয়েটি চোখ মেলে দেখলে! দেখে মনে হয়, সে যেন স্বপ্ন দেখছে! খানিকটা বিহ্বল হয়ে চেয়ে থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল! "উঃ আমি কোথায়?" পুনরায় ফুলের মত যেন ঢলে প'ড়ে পথিক বললে, "তুমি বেশ নিরাপদেই আছ, এখন একটু হাঁটতে পারবে কি? কাছেই একখানা ঘরে আমরা যাব! তারপর তুমি একটু সুস্থ হলেই তোমায় তোমার বাড়ীতে পোঁছে দেবো, তোমার কিছু ভয় নাই।" মেয়েটি যেন লজ্জা পেয়ে উঠে বসল; বললে "চলুন, কোথায় যাবেন!" অতি কষ্টে শিথিল চরণে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি যুবককে সহায় করে এসে পোঁছাল, একখানি অল্প পরিসর অন্ধকার ঘরে, ঘরের ভেতর চোখে পড়ল একখানি জীর্ণ তক্তাপোষ। তক্তাপোষ দেখে পথিক খুসী হয়ে গেল, মেয়েটাকে বললে, তুমি এইখানে শুয়ে পড়। মেয়েটিকে— কিন্তু দেখে মনে হল যেন সজীব হয়ে উঠেছে, মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলে, না, আমি একটু বসেই থাকি! কিন্তু মনে হল শরীরের জড়তা একটু কাটলেও

মনের অবসাদ যেন তার বেড়ে গেছে হঠাৎ, উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে বলে উঠল! "আমায় কেন আপনারা এখানে নিয়ে এলেন?" পথিক বললে, "কেন? এনে কি কিছু অন্যায় করেছি? তুমি কে, তোমার বাড়ী কোথায়? অমন করে মাঠের মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে কেন? তুমি হাঁটতে পারলেই বাড়ী যাবে, চল, না হয় এখনি দিয়ে আসি!" মেয়েটি ছুটে এসে দুজনের পায়ে পড়ে, বলে, "না না, আমার বাড়ী নেই, আমার কেউ নেই!" পাগল চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ায়,"তবেইত বেশ হয়েছে,বাঁচা গেছে, তিনজনেরই এক বোল, বাঃ ভাই বেশ। কিন্তু বাবা পেট সঙ্গে আছে। চললুম আমি, তোমরা সুখী হও।" পথিক বলে "দাঁড়াও ভাই, একটু মেয়েটিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে অন্য কথা!" পাগল হো হো করে হেসে বলে, "কেউ নাই যার তার আবার বাড়ী! পাগল নাকি!" বলেই চলে গেল, মেয়েটির কথা শোনবার তার কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হোলো না। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলে যেতে লাগল!

"অনেক কষ্টে অত্যাচারে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছি, সেখানে ফিরে যাবার পথ আর আমার নেই! বাপ মা বহুদিন মারা গেছেন একমাত্র দাদা বিলেত গেছে, আজ ক'বছর হ'ল কিন্তু যাদের কাছে পরম আত্মীয় জ্ঞানে আমায় রেখে গেছে, তাদের স্নেহের চিহ্ন মাত্র বুঝি আমার মধ্যে নেই। যাহোক অত্যাচার আর সহ্য করতে পারিনি, দিন দিন আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা আমার বলবতী হয়ে উঠল! কিন্তু কি করে আত্মহত্যা করব, মাথায় এল বিষ খাব। বিষ কে এনে দেবে? কাল রাতে মনে হল, যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব, জগতে কোথায় আশ্রয় না মেলে গঙ্গায় আশ্রয় নেব। সকলে যখন ঘুমিয়ে

পড়ল, আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজা খুলে দে ছুট! কোথায় যাচ্ছি তার ঠিকানা নেই. এখন দেখছি এইখানে!"

এই কথা কয়টি বলেই, মেয়েটি খুব কাঁদতে লাগল। পথিক ব্যথিত হয়ে বললে, "তা অত কাঁদছ কেন? তুমি কি চাও বল!" মেয়েটি সকরুণ চোখ দুটি পথিকের পানে নিবদ্ধ রেখে বললে,"বলবার কি আছে, আমায় যদি তাড়িয়ে দেন, আমি এখনি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তাদের বাড়ীতে আর নয়! তাদের কাছে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে বাঞ্ছনীয়! নেহাৎ আমার মরণ না হয় পথে পথে ভিক্ষা করে খাব। আমায় কি একটু আশ্রয় দিতে পারবেন না?" পথিক ম্লান হেসে বললে... "আমি নিজে নিরাশ্রয় কপর্দ্দকশূন্য,—ব্যবসায় সর্ব্বস্বান্ত পিতৃব্য কর্তৃক বিতাড়িত মনে করেছিলাম আমার মত দুঃখী জগতে কেউ নেই। কিন্তু এখন দেখছি, না, বড় ভুল, সকলেই ভাবে যে তার চেয়ে দুঃখী কেউ নেই! যাক তোমায় কোথাও যেতে হবেনা, আমি বি-এ পাশ করেছি সামান্য ২০৲ টাকার কি একটা চাকরী জুটবে না? এই উদাস অনাথ পাগলের সঙ্গে দুদিন থেকে যাওয়া যাক, অদৃষ্ট কোথায় নিয়ে যায়!" দুজনেই হতাশ হয়ে নিজ নিজ অদৃষ্টের কথা ভাবে।

এক সঙ্গে দু'জনেই চেয়ে দেখে পাগল এক মুটে সঙ্গে করে এসে হাজির! মুটে চাল, ডাল, তরী তরকারী অবশ্যকীয় দ্রব্য নাবিয়ে দিয়ে, নিজের পাওনা বুঝে নিয়ে চলে গেল, পথিক ও মেয়েটি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে পাগলের মুখের দিকে চেয়ে রইল! পাগল মন বুঝে বলে, "কি তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ? আমি কোথা থেকে এসব আনলুম? জগতে সবই আশ্চর্য্য হে, হে, এখন খাবার জোগাড় কর।" মেয়েটির দিকে ফিরে

বলে, "কি রাঁধতে জান ? হ্যাঁ তোমার রূপ আছে বটে," বলেই অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ! কিন্তু হঠাৎ হেসে বলে ? "হুঁ হুঁ রূপেতে কি পেট ভরে ? এখন রান্না চড়াও বুঝলে ? ভায়া আমার কাল থেকে খাই-খাই কচ্ছেন, কিন্তু তোমায় দেখে—ক্ষুধা তৃষ্ণার, হেঁ তা যাক, এখন উঠে ঐ পুকুরে স্নান করে এস।"

কে এ পাগল ? সত্যি পাগল না পাগলের ভাণ মাত্র ? দিন কারও সুখ-দুখের অপেক্ষা রাখে না ! দিন কেটে যায় !—পথিক চাকরীর অন্বেষণে মাঝে মাঝে বেরোয় ! হায় রে, আজকালকার বাজারে কি সহজে চাকরী মেলে ? কিন্তু তার বিবেক বলে, এমন করে পাগলের উপর অত্যাচার করা ঠিক নয় ! কিন্তু ব্যবস্থাও কিছু হয়ে উঠেনা। পাগল কোথা থেকে খাবার জোগাড় করে আনে, মেয়েটি রন্ধন করে, তিন জনে খায়, এমনি করে আর কতদিন যাবে ? পাগলেরও কোন ভাবান্তর দেখা যায় না। তেমনি গান গেয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে দুরন্ত বাতাসের মত আসে আবোল তাবোল বকে আবার চলে যায় ; এরা দুটী তরুণ তরুণী ভাবে তাইত এই ভাঙ্গা ঘরে এই হতাশার জীবন কবে অবসান হবে ? ভাবতে ভাবতে একদিন দুজনেই অবাক হয়ে এই পরম সত্য আবিষ্কার করে ফেলে, যে তাদের নিজেদের অজ্ঞাতে কখন তারা পরস্পরের অতি নিকটে এসে পড়েছে, অলক্ষ্য প্রেম-দেবতার অযাচিত বর্ষণ ধারায় স্নাত হয়ে ;—তাই এই দুঃখের হতাশার জীবনেও মধুময় করে' দিন অতিবাহিত করছে। কিন্তু দুজনেই স্থির করলে, না, আর তারা পাগলের গলগ্রহ হয়ে থাকবে না, পাগল না হয় কিছু বলে না। না বলে তাদেরও কি মনুষ্যত্ব নেই ! আহা ঐ উদাস-পাগলকে যেন ধরে

বেঁধে তারা তাদের স্বার্থ বজায় রাখছে! কিন্তু সত্যি করে পাগল তাদের বড় ভালবাসে! তরুণ উঠে দাঁড়ায়, মেয়েটিকে বলে! "চল আজই এই স্থান ত্যাগ করে, নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করব দুজনে, কেউ কারুর পরিচয় দরকার নেই, পরিচয় শুধু প্রেমে। প্রেমের বলে মানুষ সব তুচ্ছ করে; এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। কোথায় যাব, কোথায় যাচ্ছি জানিনা, এস হাত ধর চল।" তরুণী তার জীবন-প্রভাতে যাকে একমাত্র অবলম্বন করেছে, সানন্দে বড় নিশ্চিন্তে এসে তার হাত ধরে বললে, "বেশ তবে চল। কিন্তু পাগলের জন্য বড় মন কেমন করছে, তাকে একবার বলে যাওয়া উচিত, তার ঋণ কি শোধ করতে কেউ পারে?" পথিক হেসে বলে,"মেয়েদের মন বড় কোমল, কিন্তু পাগল বুঝি সর্ব্বত্যাগী, কারুর যাওয়া আসায় তার কিছু এসে যায় না, চল এগিয়ে দেখি! যদি দেখা পাওয়া যায়! সত্যি না বলে গেলে, সে কিন্তু খুঁজবে!" পাগলকে খুঁজতে হয় না,পথে বেরোতেই পাগলের সঙ্গে দেখা। তাকে বলতে হয় না, খুঁজতে হয় না, সে আপনি বলে উঠে, "কি তোমরা যাচ্ছ নাকি? তাত যাবেই, কে আর থাকতে এসেছে বল?" বলে ফিরেও সে তাকায় না, চোখের সামনে দেখতে দেখতে দূরে মাঠের কোলে মিশিয়ে যায়, কিন্তু তার গানের ক'লাইন শুধু ভেসে এসে নিরুদ্দেশের যাত্রীদের প্রাণে বড় করুণ সুরে বেজে উঠে, ঐ সে গান শোনা যাচ্ছে—

"অনন্ত সাগর মাঝে, দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে সুখ গেছে দুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, নীলশূন্যে মিশাইয়া!"

সত্যি দুইজনেই ভাবে, সামনে রাত্রি আসছে এই কপর্দকশূন্য বস্ত্রহীন আজ কোথায় তারা আশ্রয় পাবে? এই বিপুল বিশ্বে কি তাদের জন্য আশ্রয় নেই? যখন মানুষ সত্যিই বড় অসহায় নিজেকে মনে করে, তখন বুঝি সেই একমাত্র অসহায়ের সহায় সেই জগদীশ্বরকে স্মরণ করে। দুজনেই মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে অন্যমনস্কে পথ চলে। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, পশু পক্ষী যে যার নীড়ে ফিরে, তাদের চিত্তকে আরও ব্যাকুল বিহ্বল করে। সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা বেজে উঠে, ভাল করে আর পথ চেনা যায় না, প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে যাওয়াই ভাল, নচেৎ গলিতে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। তরুণ বললে, "চল এই বড় রাস্তা দিয়ে গিয়ে, ফুটপাথের উপর বসা যাবে। নেহাৎ পেটের জ্বালা ধরে, না হয় ভিক্ষেই করা যাবে কি বল?" তরুণী বলে "আমি কিছু ভাবতে পাচ্ছিনা, আজ কিছু না খেলেও চলবে। কাল তখন দেখা যাবে, চল।"

অগণিত লোক গাড়ী ঘোড়া যে যার গন্তব্য পথে ছুটেছে! এমন সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনা—একখানি মোটরে আগুন লেগে গেছে, মোটরের ভিতর কে আর্ত্তনাদ করে উঠল, বাঁচাও বাঁচাও। লোকে লোকারণ্য কে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ সংশয় করে বিপন্নকে বাঁচাবে? সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে চেয়ে দেখলে এক তরুণ যুবক সেই আগুনের মধ্যে ঢুকে একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোককে কাঁধে করে নিরাপদ স্থানে এনে নাবাচ্ছে, একটী সুন্দরী তরুণীও মুহূর্ত্তে যুবককে সাহায্য করতে ছুটে এসেছে। এরা কে? লোকের ভীড় ঠেলে, পুলিশ ডাক্তার এসে নিরীক্ষণ করে সব দেখতে লেগে গেছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু সুস্থ হলেন, বিশেষ আঘাত লাগেনি, তবে শরীরের স্থানে স্থানে খানিক

খানিক পুড়ে ঝলসে গেছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক পুলিশকে বললেন, আমায় একখানা ট্যাক্সি এনে পৌঁছে দাও, অমুক ঠিকানা, সকলেই চমকে উঠল। ইনি সহরের একটা নামজাদা ধনী। অনেকেই এখন ছুটে এল সাহায্য করতে! হায় রে পয়সা! যাহোক আর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। ট্যাক্সি এল, প্রৌঢ় উঠে দাঁড়ালেন তরুণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, এই মা-টি কে?" তরুণ উত্তর করলে "আমার স্ত্রী।" প্রৌঢ় বিনাবাক্যব্যয়ে দুজনের হাত নিজের দুই হাতে নিয়ে বললেন, "চল আজ থেকে তোমাদের হাত ধরে আমার বাকী জীবন কাটিয়ে দেব।" তিন জনে ট্যাক্সিতে উঠল, ট্যাক্সি প্রৌঢ়ের গৃহাভিমুখে রওনা হল।

যখন বাড়ী এসে তারা পৌঁছাল তরুণ তরুণী ভাবলে, আলাদিনের প্রদীপের মত সব ঠেকছে, তবু সেই বাজীকর ও প্রদীপ চাই। তারা সুস্থ হ'লে, এতক্ষণে প্রৌঢ় ভদ্রলোক তরুণকে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা তুমি কে? তোমার নাম কি? নিবাস কোথায়?" তরুণ উত্তর করলে পরিচয় কি দেব? আমি বড় হতভাগ্য নিবাস ছিল বীরভূম জেলা, নাম অচিন্ত্য। চাকরীর চেষ্টায় ঘুরছি! সদবংশের ছেলে এইটুকু আমার পরিচয়।" প্রৌঢ় হেসে বলেন, "এইটুকু পরিচয় পেয়েই আমি কৃতার্থ, তুমি আমার প্রাণদাতা—আজ থেকে আমিই তোমার, আর আমার যা কিছু সে তোমাদেরই। কিন্তু তোমার এই স্ত্রীকে দেখে, আমার বন্ধুকন্যার কথা মনে হচ্ছে। আমার বাল্যবন্ধু অমরকে মনে পড়ছে, তারও একটা ছেলে একটা মেয়ে, বহুদিন সে মারা গেছে ছেলে অমরেশ শুনেছি বিলাত গেছে, মেয়ে সবিতা কোথায় আছে তা জানি না, তোমার স্ত্রীকে দেখে সেই ছোট্ট সবিতার কথা মনে হচ্ছে। আমি

অবিবাহিত কাজেই আমার সংসার নেই। নাম শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।" তরুণী হঠাৎ ছুটে এসে প্রৌঢ়ের পায় পড়ে আকুল হয়ে কেঁদে বলে,"আমিই সেই সবিতা !" সব পরিষ্কার হয়ে যায় !

আজ আর তারা রাস্তার পথ চলা পথিক নয় ! রীতিমত বড়লোক, অচিন্ত্যর বড় চাকরীত জুটলই, সঙ্গে সঙ্গে টাকা, বাড়ী. গাড়ী, রাতারাতি বড়লোক ! বিলাতে টেলিগ্রাম গেল অমরেশের কাছে। শুভ সংবাদ সবিতার ও অচিন্ত্যের কাল শুভ বিবাহ।"

শীতের কুহেলিকা কেটে গেছে, চতুর ফাল্গুন সবে তার রূপ বিশ্বে জানাতে আরম্ভ করেছে, ফুলের গন্ধে পাখীর গানে আকুল করে; ধীরে ধীরে মলয় বাতাস বইছে। সামনে আগতপ্রায় দিন উজ্জল স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো অচিন্ত্য সবিতার সৌভাগ্যলক্ষ্মী ফিরে এল নব বসন্ত সমাগমে।

চিরসাথী

কারসিয়ং পাহাড়, অক্টোবর মাস, বেশ শীত পড়েছে, সকলে—এই সময়টাই এখানকার সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর সময় বলে, আর দেখাও যায়—এই অক্টোবর নবেম্বর মাসেই অনেকে এইখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন, আমাদের শ্যামল রায়ও ঠিক অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হবে কারসিয়ং পাহাড়ে এলেন শরীর সারতে—সঙ্গে তরুণী ভার্য্যা রেবা রায়। শ্যামল রায়কে দেখতে এককথায় বলা যায় সুপুরুষ, বয়স তিরিশের মধ্যে কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন গায়ে এক ফোঁটা রক্ত নেই ফ্যাকাশে, মুখের ভেতর শুধু চোখ দুটি, জ্বল জ্বল করছে। রেবা ঠিক স্বামীর বিপরীত, তার দেহে লাবণ্যের সীমা নেই, ধবধবে রং, মুখ চোখ চলনসই, রূপসী বললে অত্যুক্তি হয় না, বয়স আন্দাজ কুড়ি একুশ হবে।

এহেন শ্যামল রায় ও তার পত্নীর বাসস্থান কোথায় হল সকলেই হয় ত জানতে চাইবেন, আমি যতদূর জানি তাই বলে যাচ্ছি।

সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীরা এই দম্পতিযুগলের থাকবার ব্যবস্থা খুব যত্নের সহিত করে দিলেন, কারসিয়ং-এ এই বাঙ্গালী ভদ্রলোকরা

তাঁদের দেশের লোক পেলে বড় আপন ভেবে কাছে টেনে নেন, এমনি স্বদেশের মাটীর গুণ। যা'হক শ্যামল রায় ও রেবা বড় ঝরণার ধারে সেই ছোট্ট বাংলোটা ভাড়া নিলেন ;—বাংলোটার নাম "বিরাম"; কতদিন থাকা হবে স্থিরতা নাই, বাড়ীটা ছোট্ট হলেও—ভারী সুন্দর জায়গায় অবস্থিত নির্জ্জন পাহাড়ের গা বেয়ে বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দিনরাত ঝম-ঝম করে ঝরণার জল নীচের দিকে এঁকে বেঁকে চলেছে—ঝরণার আশে পাশে মস্ত মস্ত পাথরের টিপি, তারই পাশে কাঠ গোলাপের বন, এখানে অনেক প্রেমিক প্রেমিকার আবির্ভাব হয় এমন রমণীয় স্থানে যে আসে সেই তন্ময় হয়ে যায়—বিশেষ প্রেমিকদের দল একবার এলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের প্রেমের গান ঐ ঝরণার সুরের তালে তাল মিশিয়ে এক অপূর্ব্ব সুরলহরীর সৃষ্টি করে। প্রেমিক ছাড়া স্থান-মাহাত্ম্য আর কে বুঝবে!

একদিন এই পাথরের একটা বড় টিপির উপর দেখা গেল—দুটি নূতন যুগল মূর্ত্তি। তারা হচ্ছে—আমাদের নব পরিচিত শ্যামল রায় ও রেবা।

রেবা হঠাৎ স্বামীর দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল "আজ তুমি ভারী হাঁফাচ্ছ! এতটা না উঠলেই হত।"

শ্যামলকে সত্যই আজ বড় দুর্ব্বল দেখাচ্ছে কারসিয়ং—এ মাত্র তারা এই দিনপাঁচেক হ'ল এসেছে, কিন্তু শ্যামলের শরীর সারা ত দূরের কথা, বরং যেন বেশী রুগ্ন হয়ে পড়েছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে "অনেকদিন ধরে ভুগছি, ও কি একদিনে সারে? কলকাতা থেকে আসা, পথের কষ্ট ত আছে, তারপর নূতন জায়গায় এসে পড়েছি, এইবার সারব।"

শ্যামল আজও স্ত্রীকে সেই কথাই আবার জানালে "ও কিছু না, ক'দিন ভাল করে বিশ্রাম হয়নি, তাই! তুমি বস এইখানে খানিকক্ষণ আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুই—ভারী চমৎকার জায়গাটা—এই জায়গাটা এত ভাল লেগেছে এখান থেকে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা যায় না বাড়ীটা কেনবার চেষ্টা করলে হয়!"

রেবা বললে "তার মানে? কারসিয়ং পাহাড়টা ভাল লেগেছে না এই ঝরণার ধারটা?"

"যেটা হক একটা ধরে নাও"—শ্যামল এই বলে সত্যই রেবার কোলে মাথা দিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

রেবা ভারী উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে—

"একি তুমি সত্যি এখানে শুয়ে পড়লে যে জ্বর এল না কি?"

"না, না, রেবা রাতদিন অসুখের কথা তুলোনা, ভাল লাগেনা তোমাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে আমায় খানিকটা সুস্থির হয়ে দেখতে দাও।" শ্যামল রেবার অনিন্দ্য সুন্দব মুখ পানে চেয়ে রইল—তখন পাহাড়ের গা থেকে জংলী গোলাপ ও পুদিনার ঘন সুগন্ধ ভেসে আসছিল, নির্জ্জন, নিভৃত—অরণ্যের মাঝে তারা দু'জনে আজ অতীতের স্মৃতিতে বিহ্বল হয়ে পড়ল, কত কথা আজ মনে পড়ে যায়—

সূর্য্য তখন পাহাড়ের শেষ সীমান্তে যাবার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে ছুটেছে, কখন ঝপ করে বুঝি অন্ধকার হয়ে যায়। চারিদিকে অরণ্যের ঝিল্লিরব ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, শ্যামল অনেকক্ষণ অনিমেষ চেয়ে থেকে রেবার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললে "রেবা তোমার ভাবনা দেখলে সত্যি আমার ভারী দুঃখ হয়—এ

১৬

যেন আমার রোগের যন্ত্রণার চেয়ে বেশী—তুমি রাতদিন কি ভাব রেবা ?"

"কি আবার ভাবব ? তবে বিদেশ বিভুঁই জায়গা, তার উপর তোমার এখানে এসে অবধি শরীর যেন আরো ভেঙ্গে পড়েছে, একলাটি আমার এত সাহস যেন উচিত বলে মনে হচ্ছে না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে চল ঘরে গিয়ে শোবে—"

"আঃ আবার সেই রোগের কথা—মনে হয়—হয় মরি—না হয় বাঁচি—এ জীবন-মৃত্যুর সন্ধি স্থলে আর ভাল লাগে না, বড় অসহ্য হয়ে উঠছে—"

রেবা মুখখানিকে বড় ম্লান করে বড় করুণ সুরে বলে উঠল—

"তুমি একটুতে ভারী অধৈর্য্য হয়ে পড়"—শ্যামলের কণ্ঠে বেদনা ঝরে—পড়ল, বললে "অধৈর্য্য কি সাধ করে হই রেবা ? আমি যে কত ভুল কত অন্যায় করেছি তার পরিণাম।"

"এ কথা কেন বলছ ? কেন তুমি কি অন্যায় করেছ ?"

"সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করছ রেবা ?"

"হ্যাঁ আমিত জানিনা তুমি কি অন্যায় করেছ !"

"কি অন্যায় ? তোমায় বিয়ে করে কি আমি সত্যিই—"

"তবে কেন বিয়ে করলে ?"

রেবা মুখ ভার করে অন্য দিকে চেয়ে রইল, শ্যামল বললে—

"কেন বিয়ে করলাম এতদিনেও তুমি কি বুঝতে পারনি—নিশ্চয়ই পেরেছ—কিন্তু রেবা সত্যি কথা বলতে কি কাজটা ভাল করিনি, বড় স্বার্থপরের মত কাজ করেছি। ডাক্তারেরা আমায় বার-বার সতর্ক

করে দিয়েছে—বিবাহ করা আমার উচিত নয়! বিবাহ করলে নিজে ত মরবই—সেই সঙ্গে আর একজনকে ··হ্যাঁ আজ বুঝছি কথাটা মৃত্যুর মতই সত্য—"

রেবার দুই চোখ জলে ভরে এল, শুধু সে বললে "কি যে বকে যাচ্ছ, তার ঠিক নেই, এই ত বেশ খানিকটা শুয়ে নিয়েছ, সন্ধ্যে হবার আগেই ঘরে যেতে হবে," পাহাড়ে সূর্য্য ডোববার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার, শ্যামল অন্যমনস্কে বলে উঠল—

"হ্যাঁ সূর্য্য ডুবতে আর বেশী দেরী নেই। আর একটু শুয়ে যাচ্ছি রেবা, লক্ষীটি একটু বস!" বলে শ্যামল চোখ বুজলে রেবা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—

"ওমা এখানে ঘুমিয়ে পড়োনা যেন।"

"না না ঘুম আসতে এখনও দেরী আছে আর বাড়ীত দূরে নয়, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"না না এই ভর সন্ধ্যে বেলা আর শোয় না, সত্যি ঘুমিও না।— যেন।"

"আচ্ছা।" কিন্তু শ্যামল ঠিক তেমনি করে চোখ বুজে পড়ে রইল।

রেবার কানে বাজতে লাগল শ্যামলের অসংলগ্ন কথাগুলো—ভুল— অন্যায়? সে কার? রেবার না শ্যামলের? রেবা ভাবে—না—না— কারুরই ভুল নয়—অন্যায় নয়—এর চেয়ে ঠিক, এর চেয়ে ভাল—আর কিছু হয় না। দুজনেরই হয়ত সব মনে পড়ে যায় সে পুরানো কথাগুলো প্রথম যেদিন রেবার দাদা অজিতের সঙ্গে তার বন্ধু শ্যামল রেবাদের বাড়ীতে গেল। রেবা গেল তাদের চা দিতে দুজনের দেখা হতেই

যাকে বলে "Love at first sight" ঠিক তাই, পরস্পরে ভেবেছিল এতদিন তারা কেমন করে] দুজনে দু'জনকে ছেড়ে ছিল ! এইবার কিন্তু বাকী জীবন একসঙ্গে কাটাতে হবে, আর ব্যবধান নয় !

ক্রমে শ্যামলের রেবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে গেল, শ্যামলের বাড়ী ঘর অগাধ পয়সা সবই আছে—কিন্তু ঘরে কোন আকর্ষণ নেই, ঘরে আপন জনের ভেতর আছেন বৈমাত্রেয় এক বড় ভাই এবং ভ্রাতৃজায়া ও তাঁদের পুত্র কন্যারা। শ্যামলের শরীর কোনদিন ভাল নয়, মা মারা যাবার পর সে কলকাতায় খুব কমই থাকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় সে প্রায় বারো মাসেই ঘুরে বেড়ায়। সবাই বলে এই ভাল জায়গায় থাকার জন্যই শ্যামল এখনও টেকে আছে কিন্তু এবার শ্যামলের বেড়াতে যাবার ব্যতিক্রম দেখা গেল, সে কলকাতাতেই রয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করে "কি হে শ্যামল, ব্যাপার কি বলত ! অজিতের বাড়ীত তোমার এই বলে 'থাক—তা হাওয়া খাওয়া বন্ধ করলে শরীর টে'কবে কেন ? যে রকম ব্যাপার দেখছি—তাতে—"

শ্যামল স্মিতহাস্যে জবাব দিত "হ্যাঁ ব্যাপারটা ঘোরাল বোধ হচ্ছে ভাই !" বন্ধু জবাব দেয়—

"তা সে যাই হোক, শরীরটা আগে।" শ্যামল চিন্তিত ও ক্লিষ্ট হয়ে বলে "কেন আমায় রুগীর মত মনে হচ্ছে নাকি ? আমিত বেশ ভাল আছি—আর তোমরাও যেমন, কার জন্যেই বা শরীর ? সত্যি ক'রে বলনা ভাই, আমায় দেখে কি মনে হয় তোমাদের ?"

বন্ধুরা বলে—

"না তা কেন ও সব বড়লোকী রোগ তোমার মত লোকেই পুষে

থাকে ভাই। চেহারা তোমার দিব্য আছে। তবে কি জান দাদা, এই আমরা হলে গোরে ব্যাং ডেকে যেত—ত একটু সতর্ক থেকো, চিনি খাওয়া ভাল চিনি হওয়া ভাল নয়, বুঝলে হে।"

আর একজন বলে উঠে:

"শ্যামল তোমার শরীরের ব্যাধিকে এতদিন পুষে রেখেছ বটে, কিন্তু ভায়া,—মনের ব্যাধি তোমার বাগ মানে কিনা দেখ, ও ভারী সাংঘাতিক!"

শ্যামল ও রেবার আলাপের প্রায় ছমাস পরেই রেবা আই-এ পাশ করলে রেবার মা এইবার রেবার বিবাহের জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—বিয়েত দিতেই হবে—আর দেরী করা কেন? স্বামী মারা যাবার পর অতিকষ্টে ছেলে মেয়ে দুটিকে মানুষ করেছেন—অজিত ত বি-এ পাশ করে ক'বছর ধরে টিউসানী করছে ভাল চাকরী এ পর্য্যন্ত একটী জুটল না, কোন রকমে দিন গুজরান হয়, রেবার মা ভাবেন, রেবার একটী সম্বন্ধ অজিতকে করতে বলবেন, এমন সময় ভগবান জুটিয়ে দিলেন শ্যামলকে—এইবার মা একদিন অজিতকে ডেকে বললেন,—

"হ্যাঁ রে অজিত—শ্যামল আর রেবার বিয়ে দিলে বেশ হয়! একবার কথাটা পেড়ে দেখনা—তোর ত কোন গা দেখিনা।"

"কি বলছ মা তুমি, শ্যামলের সঙ্গে রেবার বিয়ে? ও কথাটি একদম ভুলে যাও।"

"কেন রে, এই তুই বলিস তোর বন্ধুদের ভেতর শ্যামল সেরা ছেলে, বি-এ পাশ, অগাধ পয়সা, দেখতেও কার্ত্তিকের মত, যাকে বলে রূপে, গুণে, ধনে, শীলে, মানে তবে আবার বাধাটী কি শুনি?"

"বাধা? দেখ মা পাত্র হিসাবে দেখতে শুনতে সব ভাল, তবে এক দোষেই সব মাটি মা!"

মা বিরক্ত হয়ে বলেন।

"দোষটী কি শুনি?"

"যাক বলবার ইচ্ছা ছিলনা তা নেহাৎ তুমি যখন রেবার সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়লে তখন বলতেই হবে। ঠিক শ্যামলের দোষ নয় মা—ওদের বংশগত দোষ কি জান? মায়ের তরফ থেকে থাইসিসে ওদের তিন পুরুষ মরেছে—আর শ্যামলের একটী দোষ আছে—সেটা হচ্ছে—এই বড়লোকের ছেলে—একটু আধটু দামী মদ খায়! এ দোষটী বোধ হয় বাপের তরফ থেকে পেয়েছে—"

বলেই অজিত হেসে ফেললে।

অজিতের মা ভারী উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হয়ে বললেন—

"কি যে হাসিস শুনে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এতদিন কি একটু আমায় বলতে নেই! আমি সাবধান হতুম—তুই এতবড় ছেলে, তোর কি এখনও একটু আক্কেল বিবেচনা হল না—ধিক তোকে! আমি শ্যামলকে দেখে অবধি মনে করছি রেবার সঙ্গে বিয়ে দেবো। হায় রে আমার কপাল! এতটা মেলামেশা করতে দেওয়া তবে মোটেই উচিত হয়নি—বড় ছেলে বড় মেয়ে।"

"আহা মা তাতে হয়েছে কি? তোমার যত সব—"

"থাম থাম বাঁদর ছেলে—আমি দেখছি তোর সব বিদ্যা ঐ পুঁথিগত নিজস্ব জ্ঞান তোর হ'বে কবে?"

"আচ্ছা মা তুমি মিছে চট্‌ছ, আমার পঞ্চাশজন বন্ধু আছে সকলেই

ত এখানে আসে, তাদের প্রত্যেকের শারীরিক মানসিক সাংসারিক খবর যদি তোমায় দিতে হয় তবেই ত গেছি !"

"যা, যা বেশী লেকচার ঝাড়িসনি !"

"হ্যাঁ মা আজ কি মাসকাবারের শেষ ?"

"কেন ?"

"এই তোমার মেজাজটা দেখে আন্দাজ করছি—"

"তাতো করবেই—আমারই শেষ হলে বাঁচ।" বলেই অজিতের মা ঘর থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন, অজিত বুঝলে মা রাগ করে চলে যাচ্ছেন—মার একটু মুখভার অজিত সহ্য করতে পারে না তা ছাড়া মা যে কেন এত বিরক্ত হয়ে উঠলেন তাও ঠিক বোঝা গেল না—তাড়াতাড়ি অজিত মাকে ডাকলে :

"মা, মা শুনে যাও।"

মা ফিরে দাঁড়ালেন—বললেন, "দেখ কিছু উপায় হয়ত বল, মিছে বাজে বকিসনি,—আমি বেশ বুঝেছি—রেবা শ্যামলকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে সুখী হবে না।"

অজিত এবার চটে গেল বললে 'তার চেয়ে বলনা মা—যে গরীবের মেয়ে থাইসিস্-ই হোক আর নব্বই বছরের বুড়োই হোক বিয়ে দিলেই হল !"

"আমারই কি তাই ইচ্ছা অজিত ! তবে এতদিন মেলামেশা করছে দুজনেরই ত একটা—"

"বলনা থামলে কেন ?"

"এই ভালবাসা মায়া পড়েছে—"

ভালবাসা, ভালবাসার কাঁথায় আগুন! এরি মধ্যে এমন কি ভাল বাসা হল রে বাপু! ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না মা, রেবার আমি খুব ভাল সম্বন্ধ করে রেখেছি, এই অসিত বিলাত থেকে এলেই কথাটা পাড়ব! ও ভালবাসা, ওরকম আজকাল মেয়েদের ফ্যাশান। রেবা গেল কোথায়, তাকে একটু চটান যেত আর শ্যামল ত বলেছিল বিলাত যাবে শরীর সারতে। বাবা! কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াও বিপদ দেখছি! না এবারে সাবধান হতে হবে!"

মা গম্ভীর হয়ে চলে গেলেন, জানেন পাগল ছেলের কথার বাঁধাধরা নেই—কখন কি বলে বসে!

রেবা কিন্তু দরজার পাশ থেকে সব শুনেছিল—পাছে অজিত তাকে ডাকে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি একখানা বই নিয়ে ছাতে উঠে গিয়ে ভাবতে বসল! আচ্ছা মা কি করে সব জানতে পারেন—সত্যি বিয়ে যদি করতে হয় ঐ শ্যামল দা'কে ছাড়া আর কাউকে নয়! হলোই বা রোগ—মরব ত সবাই একদিন।"

অজিত এতদিনে নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ভারী হতাশ হয়ে পড়ল—কত ভাল ভাল সম্বন্ধ সে নিয়ে এল রেবার সেই এক কথা "বিয়ে করব না।" অবশেষে শ্যামলকে বিয়ে করতে রাজী হল।

বিয়ে হয়ে গেল, মা ভগবানকে স্মরণ করে মন বাঁধলেন, বললেন "যে যার বর সে তার ক'নে"—ও সব বিধিলিপি—মানুষের হাত নেই। অজিত কিন্তু বোনের উপর ভারী চট্‌ল কিন্তু উপায় কিছু হল না।

ক্রমে অজিতের রাগ পড়ে গেল—রেবা আর শ্যামলকে সে কোথাও যেতে দিলে না—কলকাতাতেই একখানা বড় বাড়ী নিয়ে সকলে একসঙ্গে

রইল—বড় সুখেই দিনগুলো কেটে যেতে লাগল—কিন্তু সকলের মনের আনন্দকে চুরমার করে শ্যামলের পুরান রোগ একদিন মাথা তুলে দাঁড়াল! অজিত প্রাণপণ সেবা করে কিছু করতে পারলে না, দু'মাস শয্যাগত থাকার পর ডাক্তারেরা বললে—"একটু জোর পেলেই পাহাড়ে চলে যান।" কারসিয়ংএ কখনও যাওয়া হয়নি কাজেই সেইখানেই যাওয়া মস্ত হল।

অজিতের অমতে বিবাহ হওয়ায় অজিত ভারী ক্ষুব্ধ হয়েছিল—রোগের সেবা যে করতে হবে চিরদিন তা সে বুঝে ছিল, কাজেই সে ভারী নিষ্ঠুরভাবেই হঠাৎ একদিন রেবাকে বলে ফেললে,—"জেনে শুনেই ত রোগ বরণ করে নিয়েছ এখন ভোগ কর! তোমরা কারসিয়ংএ মাকে নিয়ে যাও—আমায় পেটের চিন্তা করতে হবে ত! আমার যাওয়া হতে পারে না। অবশ্য যখনই কোন দরকার হবে জানিও—তখনই যাব"

রেবার কথাটা প্রাণে লাগল—সত্যই সে একাই ভোগ করবে—যা তার কপালে আছে—মুখে ম্লান হেসে মাকেও তাদের সঙ্গে যেতে নিষেধ করলে—বললে "মিছে এখানে দাদার একলাটি কষ্ট হবে মা—দরকার হলে খবর দেবো।" সেই কথাই রইল—মায়ের প্রাণ কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল। তাইত রোগা মানুষ—বিদেশে, কিন্তু তাঁর কথা কেউ শুনলে না।

রেবা আজ সত্যই ভাবলে যে সে একা এই রুগীকে নিয়ে এসে ভাল কাজ করেনি, নিজেকে আজ বড় অসহায় বোধ হল, সে ত নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে, স্বামীর চেহারা নিশ্চই খুব খারাপ হয়েছে, আবার কদিন কিছুই খেতে চাচ্ছেন না সব অরুচি—

উঃ তবে কি বাঁচবেন না? রেবার চোখে শ্রাবণের ধারা বয়ে যায়—স্বামীর একটা রোগ সে অনায়াসে সারিয়েছিল কিন্তু এ রোগ কি করে সারে? শ্যামলের আর একটা রোগ ছিল মদ খাওয়া। রেবা একদিন হাসতে হাসতে স্বামীকে বলেছিল, "তা দেখ, তুমি যাই বল না কেন, আমার চেয়ে তুমি ঐ মদকে বেশী ভালবাস।"

শ্যামল সেইদিনই মদ ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—"হ্যাঁ, একটা কিন্তু জীবনে সঙ্গী চাইত! তা তোমায় যখন পেয়েছি তখন ওটা ছাড়তে অনায়াসে পারব বোধ হয়।"

রেবা কিন্তু তবুও স্বামীকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি, বললে—"হ্যাঁ, আমি ম'লে আবার আর একটা চাইত!"

শ্যামল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল, "সেটা আমার অদৃষ্টে নয় বিবিজান সেটা তোমার অদৃষ্টে, জেনে শুনে এক থাইসিস রুগীকে বিয়ে করেছ। তুমিই বরং এই সুযোগ—"

রেবা আর্ত্তনাদ করে স্বামীর মুখ চেপে ধরেছিল—এক চোখ জল নিয়ে বলেছিলো, "কেন তুমি বারে বারে ঐ কথা বল—কে বলে তুমি রুগী—তোমার রোগ সেরে গেছে, আর কোন দিন ও কথা মুখে এনো না।"

শ্যামল ম্লান ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিল—"রেবা, লোকে কথায় বলে শিবের অসাধ্য রোগ।"

রেবা আজ সত্যই বুঝলে যে রোগ বড় সহজ নয়—শ্যামল তেমনি চোখ বুজে রেবার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে—হয়ত কত কি আকাশ পাতাল ভাবছে—রেবার দুটি করুণ আঁখি—সূর্য্যের ঐ শেষ রশ্মির পানে

চেয়ে যেন কিসের আশঙ্কায় ভীতিব্যাকুলিতচিত্তে অপেক্ষা করছে—সূর্য্যের শেষ-রশ্মি এইবার ঐ প্রকাণ্ড দৈত্যের মত কালো-কালো পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল—চারিদিকে তারস্বরে ঝিঁঝিঁ পোকা পাইন গাছের মাথায় বসে কীর্ত্তন সুরু করে দিয়েছে—ঝরণার জল কিন্তু এক ভাবেই জীবনের অনিত্যতার গান গেয়ে চলেছে—ঝম-ঝম-ঝম-ঝম গম-গম-গম—জমাট অন্ধকার—রেবার চোখের সামনে আস্তে আস্তে নেমে আসে—আর বুঝি কিছু দেখা যাচ্ছে না—আলো কোথায়? সব যে অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি শ্যামলের গায় হাত দিয়ে বলে "উঠ, উঠ অনেক রাত হয়ে গেল যে, দেখছনা কি অন্ধকার—একি তোমার গা হঠাৎ এমন গরম হয়ে উঠল কেন? যা ভয় করেছি তাই, শীগ্‌গীর এই ওভার কোটটা পর দিকিন—আমার হাত ধর—আস্তে আস্তে নেমে এস।"

শ্যামল স্খলিত কণ্ঠে বললে—"চল—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই সবে সন্ধ্যে হয়েছে, পাহাড়ের সন্ধ্যে ভারী হঠাৎ হয়, ঝপ করে সূর্য্য পাহাড়ের কোলে ডুবে যায় কিনা! তাই এই অন্ধকার বোধ হয় এখন সন্ধ্যে ছটার বেশী নয়!"

দিন দশেক পরে, রাতের গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে কারসিয়ংএর একটী নিভৃত পল্লীতে অনেকগুলি ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠল! মণিবাবু এই পাড়ার ভেতর প্রবীণ লোক সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তিনি ভারী পরোপকারী, কারসিয়ংএ সকলেই তাঁকে চেনে—রাত তখন বারোটা হবে—মণিবাবু স্ত্রীকে ডেকে বললেন "শুনছ। শ্যামলবাবু বেচারী মারা গেল। এই একটু আগে, তুমি বৌটির কাছে যাও, আমি এদিককার ব্যবস্থা করি। স্ত্রী ভারী দুঃখিত হয়ে বললেন "তা হ্যাঁ গা,

মেয়েটির মা ভাই এল না? তোমরা কিন্তু বড় দেরীতে তাদের খবর দিলে। মণিবাবু বললেন "বড় দুঃখের কথা কি করে জানব বল যে এমন রোগ চেপে রাখবে—আমি কতকটা আন্দাজ করে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শুধু বলত—"অনেকদিন ভুগে সবে উঠেছি তাই এরকম দেখছেন"। সম্পূর্ণ অচেনা এর বেশী জিজ্ঞাসাও করা যায় না, কিন্তু ভারী বিনয়ী ও ভদ্রলোক ছিল। আজ সেদিন মেয়েটি যখন ছুটে এসে আমায় বললে কাকাবাবু শীগ্‌গীর ডাক্তার আনুন, এঁর মুখ দিয়ে ভয়ানক রক্ত উঠছে—তখনি আমার মাথা ঘুরে গেছে। ডাক্তার হাল দেখেই বললেন—টু-লেট। শুনলাম সেদিন অনেকরাত পর্যান্ত ঝরণার ধারে বসেই হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেছে—আর কি হবে বল! কাল মা-ভাইকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে যতক্ষণ ওঁরা না এসে পৌছায় মেয়েটির কাছে তুমি থাকবে চল, স্বামী স্ত্রী দুজনেই শ্যামল রায় এর বাড়ী চললেন। রেবা রায়এর মা ভাই এসে রেবাকে নিয়ে চলে গেলেন।

* * * * * *

অনেকদিন পর্যান্ত রেবা ও শ্যামল রায়এর কথা সকলের মনে ছিল—বাড়ীটা তারপর থেকে আর ভাড়া হয়নি। আজ বহুদিন পরে আবার আমি কারশিয়ং এসেছি শুনলাম মিসেস রায় বলে কে একজন ঐ বাড়ীটা কিনেছেন, আমি দেখেই চিনলাম—এ সেই রেবা রায়! কিন্তু অনেকে আবার বলে—না-না সে নয়—আজ কবছরে কি এরকম চেহারা হয়ে যায়! আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস সেই শ্যামল রায় এর স্ত্রী রেবা রায়—স্কুলের টিচারী নিয়ে আবার এইখানে ফিরে এসেছেন।

সমাপ্ত